বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৪১ বার্ষিক সংখ্যা ১৪৩০

বাংলাদেশ অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি এবং কাঠামোগত রূপান্তরের ধারা ১৯৭১-২০২১: আগামীর ভাবনা

মোস্তফা কে মুজেরী*
ফারহানা নার্গিস*

১। ভূমিকা

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি এবং কাঠামোগত রূপান্তর অনেক ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধি যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আগের বছরগুলোর তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে ৮ শতাংশের বেশি হয়েছে। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতির পাঁচটি ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির মধ্যে স্থান করে নিয়েছে (World Bank, 2019)। ২০২১ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন অনুসারে, প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল, মাথাপিছু আয় এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ফলে বাংলাদেশ ২০২০ সালে ০.৬৩২ এইচডিআই স্কোর (HDI score) সহ ১৮৯টি দেশের মধ্যে ১৩৩তম স্থান দখল করে, যা মধ্যম মানব উন্নয়নের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশকে স্থান করে দেয় (UNDP, 2021)।

এই প্রবন্ধে বিগত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশ অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি এবং কাঠামোগত রূপান্তরের মূল চালিকাশক্তিগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়ন গতিশীলতা এবং এই সময়কালে গতিশীলতা বৃদ্ধির তারতম্যের কারণ ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিগত পাঁচ দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে কাঠামোগত রূপান্তর ঘটেছে তার বিশ্লেষণ এবং এগুলো বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন (ভিশন ২০৪১) এবং দেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (২০২১-২০৪১) উল্লিখিত কৌশলগুলোতে কি প্রভাব রাখতে পারে সে সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে।

২। প্রবৃদ্ধি এবং কাঠামোগত রূপান্তর ১৯৭১-২০২১: মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

একটি অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর বিভিন্ন ফলাফল যেমন আউটপুট, কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ ও ভোগের মাধ্যমে দেখা যেতে পারে। এছাড়া রূপান্তর বা পরিবর্তনের এই ধারাগুলো বিভিন্ন আঙ্গিকে দেখা যেতে পারে, যেমন খাত এবং পণ্যের গ্রুপ; গ্রামীণ এবং শহুরে অবস্থান; উৎপাদন এককের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে বিতরণ; পরিবারের আয়, ব্যয় এবং ভোগের শ্রেণি; খাত এবং কার্যক্রমে ব্যবহৃত প্রযুক্তি এবং উৎপাদনশীলতার বৈচিত্র্য; এবং কার্যক্রম, দক্ষতা, লিঙ্গ এবং সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে উপার্জনের পার্থক্য। অন্য কথায়, কাঠামোগত রূপান্তরের বিশ্লেষণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে এর প্রবৃদ্ধির গঠন এবং অসমতা বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক তুলে ধরে।

---

* যথাক্রমে নির্বাহী পরিচালক এবং রিসার্চ ফেলো, ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফিন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম), ঢাকা।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জন করার পর অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে হতাশাজনক অবস্থা বিরাজমান ছিল এবং এ সময়ের হতাশাবাদী ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে ব্যর্থ করে বাংলাদেশ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অসাধারণ ও অপ্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করেছে যা দেশটিকে এশিয়ার অন্যতম উল্লেখযোগ্য 'ফিনিক্সে' (phoenix) পরিণত করেছে। এসবের জন্য বাংলাদেশের উন্নয়ন বিশ্লেষণ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উন্নয়নের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেস স্টাডি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। বাংলাদেশের অর্জিত উন্নয়নধারা আধুনিক ইতিহাসের দ্রুততম পরিবর্তনগুলোর মধ্যে অন্যতম, এবং বাংলাদেশের অর্জনগুলো মানবিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রথাগত পন্থার সাথে তুলনীয় নয় (Mujeri & Mujeri, 2020, 2021)। নিঃসন্দেহে, বিভিন্ন খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উদারীকরণের কারণে এই রূপান্তরগুলোর অনেকগুলো অর্জিত হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশের অনন্য 'নিউলিবারেল ডেভেলপমেন্ট মডেল' (neo-liberal development model), যার অধীনে সামাজিক অগ্রগতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে অনেকটাই অতিক্রম করেছে, এই ধারার উন্নয়নে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। সঠিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা বৃদ্ধি, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়ানো, এনজিও এবং সুশীল সমাজের সাথে অংশীদারিত্ব গঠন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো এবং বিদেশে শ্রম অভিবাসন উৎসাহিত করার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

নিঃসন্দেহে বলা যায়, বিগত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের কাঠামোগত যে পরিবর্তন হয়েছে তার অধিকাংশই সামাজিক পরিবর্তন এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে (Mujeri & Mujeri, 2021)। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শ্রম বাজারের মধ্যে সম্পর্ক এবং অনানুষ্ঠানিক খাতের ভূমিকাও কাঠামোগত রূপান্তরের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৯০-এর দশক থেকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্রুততর হওয়ার বেশিরভাগ সময়ে বৈদেশিক বাণিজ্য (যেমন, তৈরি পোশাক রপ্তানির দ্রুত বৃদ্ধি) কৃষি থেকে শিল্প এবং সেবা খাত এর রূপান্তরকে আরও বেশি ত্বরান্বিত করেছিল। ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে গৃহীত অর্থনীতিব্যাপী এবং সুনির্দিষ্ট খাত ভিত্তিক কাঠামোগত ও নীতি সংস্কারগুলি সামষ্টিক অর্থনীতিকে কার্যকরভাবে পরিবর্তনের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ের পরিবর্তনে সাড়া দিতে এবং উপযুক্ত রূপান্তর গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছে। তবে এই মাইক্রো-ম্যাক্রো স্থানান্তর (micro-macro transmission) এবং সামগ্রিক রূপান্তরে এর ভূমিকা প্রথাগত উন্নয়ন বিশ্লেষণে অদ্যাবধি কম স্বীকৃতই রয়ে গিয়েছে।

২.১। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ১৯৭১-২০২১

বিগত পঞ্চাশ বছরের বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির গতিশীলতা থেকে বেশ কিছু 'স্টাইলাইজড বাস্তবতা' (stylized facts) বের হয়ে আসে। প্রথমত, বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির প্রবণতার ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও ১৯৯০-এর দশক থেকে টানা ১০-বছরে গড় প্রবৃদ্ধি স্থিরমূল্যে প্রায় এক শতাংশ হারে ত্বরান্বিত হয়েছে এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য এটি বিপরীতমুখী হয়নি (চিত্র ১ এবং ২)। এছাড়াও প্রবৃদ্ধির ত্বরণ দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির সম্ভাব্য নির্ধারকগুলির ক্রমাগত উন্নতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সময়ের সাথে আরও বেশি স্থিতিশীল হয়েছে (চিত্র ৩); প্রথমত, সকল প্রধান খাতে (কৃষি, শিল্প ও সেবা) প্রবৃদ্ধির হার স্থিতিশীল হওয়ায় এবং দ্বিতীয়ত, সেবা খাতের দিকে অর্থনীতির উত্তরণের কারণে বৃদ্ধির হার আরও বেশি স্থিতিশীল।

চিত্র ১: জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার

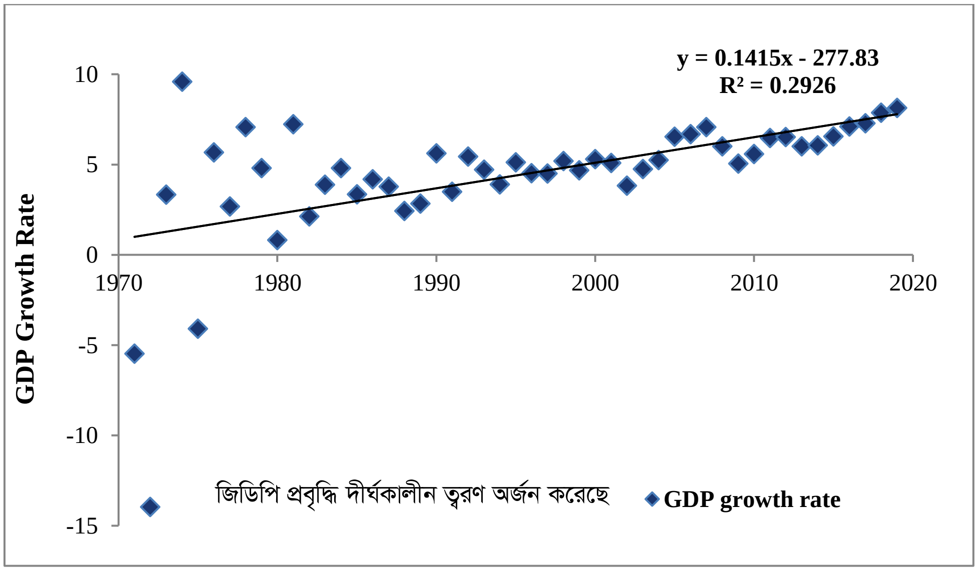

উৎস: বিবিএস (বিভিন্ন বছর)।

চিত্র ২: মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার

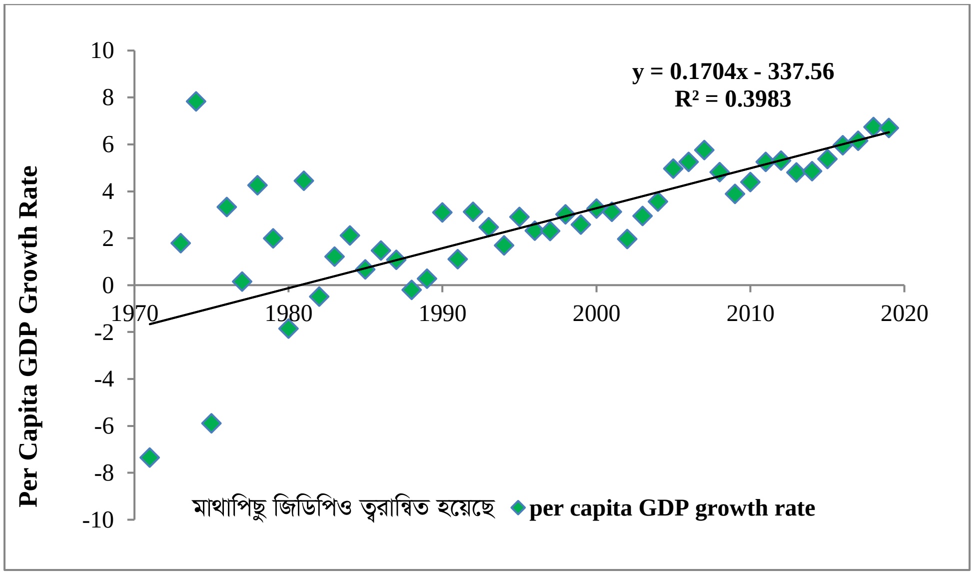

উৎস: বিবিএস (বিভিন্ন বছর)।

চিত্র ৩: ১০ বছর সময়কালে জিডিপির গড় প্রবৃদ্ধি

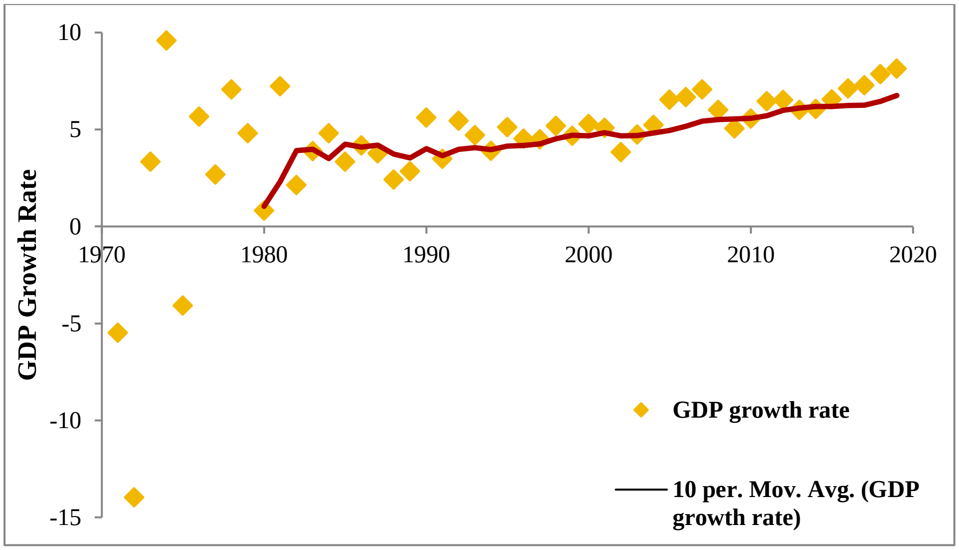

উৎস: World Development Indicators.

দ্বিতীয়ত, দ্রুত প্রবৃদ্ধির হার সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কারণেও অর্জিত হয়েছে; কেবলমাত্র বর্ধিত উপকরণ ব্যবহারে এটি সীমাবদ্ধ ছিল না। তদপুরি সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি শ্রম উৎপাদনশীলতা এবং ‘টোটাল ফ্যাক্টর প্রোডাক্টিভিটি’ (total factor productivity, TFP) উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়েছে। যদিও প্রবৃদ্ধিতে সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অবদান প্রাথমিক বছরগুলোতে তুলনামূলকভাবে কম ছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক সময়কালে তা বৃদ্ধি পেয়েছে (Mujeri & Islam, 2008)।[১] সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি খাতগুলোর অভ্যন্তরীণ বেশি উৎপাদনশীল ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন এবং সম্পদের বেশি উৎপাদনশীল কার্যকলাপে পুনঃবন্টন উভয়ের মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনা অর্থনীতির চলমান উত্থানে প্রতিফলিত এবং বিনিয়োগ, রপ্তানি ও শিল্প খাতে দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিনিয়োগের হার দ্রুতগতিতে বেড়েছে এবং বাংলাদেশ বিশ্ব রপ্তানি বাজারের ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্ব অর্জন করেছে। এছাড়াও উৎপাদন খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি টেকসইভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রধান

[১] TFP প্রবৃদ্ধির সাম্প্রতিক অনুমানগুলি নির্দেশ করে যে দেশের প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় অবদান রাখার ক্ষেত্রে সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ভূমিকা অনেকটাই গৌণ ছিল। ১৯৭২-১৯৮২ সময়কালে TFP এর বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ০.২৫ শতাংশ; কিন্তু ১৯৯১-১৯৯৬ সময়ে এটি ০.০৬ শতাংশে তীব্রভাবে হ্রাস পায় যা একটি সময়কাল যখন সঙ্কটচালিত অর্থনৈতিক সংস্কার এবং দ্রুত বাণিজ্য উদারীকরণ দ্বারা চিহ্নিত। ১৯৯৭ সাল থেকে TFP প্রবৃদ্ধি ২০০৮ পর্যন্ত বার্ষিক গড় ০.৩৬ শতাংশে ত্বরান্বিত হয়েছে; এবং ২০০৯ থেকে ২০১৯ সময়কালে আরও বৃদ্ধি পেয়ে গড়ে ০.৮৯ শতাংশে ত্বরান্বিত হয়েছে। (Mujeri & Mujeri, 2020)।

অর্থনৈতিক সূচকগুলিতে দীর্ঘস্থায়ী প্রবৃদ্ধি বর্তমান যা উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখত, বর্তমান সম্ভাবনাময় প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করা এবং সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধি আরও দ্রুত গতিসম্পন্ন করার জন্য অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করেছে।

জিডিপির প্রবৃদ্ধি উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক এবং কাঠামোগত রূপান্তরের সহায়ক। স্বাধীনতার পরবর্তীতে যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং এক্ষেত্রে ত্বরান্বিত ও ন্যায়সংগত (equitable) প্রবৃদ্ধিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় যদিও অর্থনীতির পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সময়ে এসব নীতিমালার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এই সময়ে বাংলাদেশের জিডিপি এবং মাথাপিছু জিডিপি উভয় ক্ষেত্রেই ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির ধারা পরিলক্ষিত হয় যদিও বিশেষ করে প্রাথমিক বছরগুলোতে বড় ধরনের বার্ষিক ওঠানামা লক্ষ করা যায় (চিত্র ৪)।

জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ১৯৬১-১৯৭০ সালের (স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময়কালে) ৩.৭৭ শতাংশ থেকে ১৯৭৬-১৯৮০ সালে ৩.৯৯ শতাংশে উন্নীত হয়; কিন্তু ১৯৮৬-১৯৯০ সালের মধ্যে তা ৩.৬২ শতাংশে নেমে আসে; এবং পরবর্তী তিন দশকে প্রতি দশকে গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার প্রায় এক শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাঁচ বছরের গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ১৯৯৬-২০০০ এর মধ্যে ৪.৬১ শতাংশে, ২০০৬-২০১০ সময়কালে ৫.৫২ শতাংশে এবং ২০১৪-২০১৮ সালের মধ্যে ৬.৬৩ শতাংশে উন্নীত হয় (সারণি ১)।

চিত্র ৪: বাংলাদেশের জিডিপি এবং মাথাপিছু জিডিপির প্রবৃদ্ধি

(২০০৬ সালের স্থির মূল্যে)

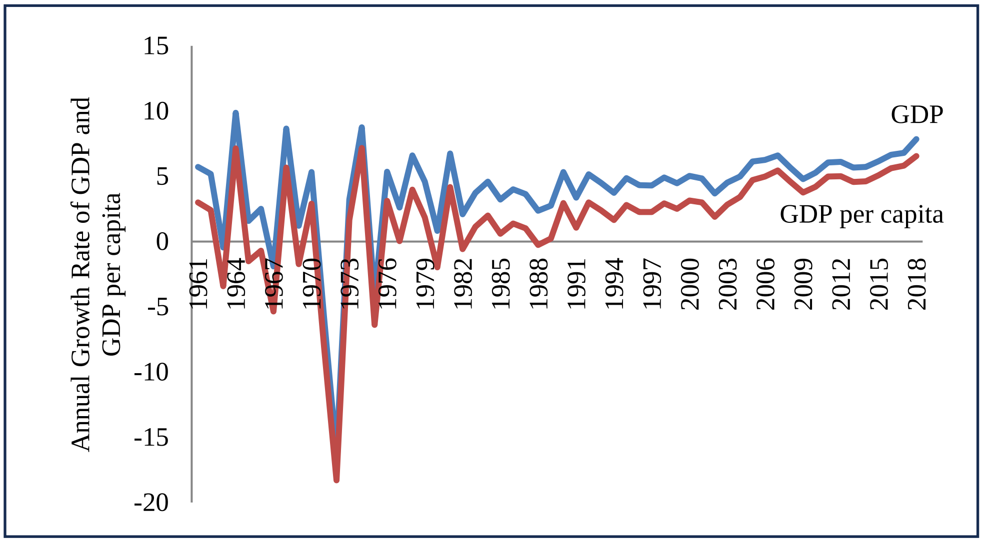

উৎস: World Bank (2018).

সারণি ১: বাংলাদেশের জিডিপি এবং মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার
(২০০৬ সালের স্থির মূল্যে)

	বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার, ধ্রুবক ২০০৬ মূল্য, %	মাথাপিছু বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার, ধ্রুবক ২০০৬ মূল্য, %	মাথাপিছু জিডিপি, ধ্রুবক ২০০৬ মূল্য, টাকা %	মাথাপিছু জিডিপি সূচক, ২০০৬ মূল্য (২০০৬=১০০)
১৯৬১-১৯৭০ (প্রাক-স্বাধীনতা সময়কাল)	৩.৭৭	১.০১	২২,৭০০	৬৮.৪১
১৯৭৬-১৯৮০	৩.৯৯	১.৪০	১৮,২৯৩	৫৫.১৩
১৯৮৬-১৯৯০	৩.৬২	১.০৭	২০,৪৯০	৬১.৭৫
১৯৯৬-২০০০	৪.৬১	২.৬২	২৫,৩৪৬	৭৬.৩৯
২০০৬-২০১০	৫.৫২	৪.৬০	৩৬,৬৩৭	১১০.৪২
২০১৪-২০১৮	৬.৬৩	৫.৫৪	৫৪,৪৮৫	১৬৪.২১

উৎস: Tables B.1 and B.2 in Statistical Annex, World Bank, 2018.

যেকোনো অর্থনীতির জিডিপির গঠন কাঠামো থেকে উৎপাদনক্ষম খাতগুলোর আপেক্ষিক গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। ঐতিহ্যগতভাবে উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাথমিক খাত (অর্থাৎ কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম) জিডিপিতে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে। দেশ যত সমৃদ্ধশালী ও উন্নত হয়, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাংলাদেশে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান বর্তমানে ১৫ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে, যেখানে শিল্প ও সেবা খাতের অনুপাত বেড়েছে (সারণি ২)। এই প্রবণতাগুলো বর্তমানের ত্বরান্বিত কাঠামোগত রূপান্তর এবং অর্থনীতির উদারীকরণের ফলে দ্রুততর হবারই সম্ভাবনা বেশি আগামী দিনগুলোতে।

সারণি ২: বাংলাদেশের জিডিপিতে খাত ভিত্তিক অবদান এবং প্রবৃদ্ধির হার
(১৯৯৫-১৯৯৬ স্থির মূল্যে)

	কৃষি		শিল্প		সেবা		জিডিপি
	শেয়ার (%)	বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার (%)	শেয়ার (%)	বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার (%)	শেয়ার (%)	বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার (%)	বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার (%)
১৯৭৬-১৯৮০	৪৩.৭৫	১.৯৮	১০.৮৮	৩.৯৩	৪৩.৬৪	৪.৩১	৩.৬২
১৯৮১-১৯৮৫	৩১.৬০	২.৬৮	১১.৫৯	৫.৪৭	৪৯.২০	৪.২৭	৩.৮১
১৯৮৬-১৯৯০	২৮.৯৯	২.১৮	১২.৮০	৫.২৪	৫০.৩১	৩.৬৪	৩.৫৬
১৯৯১-১৯৯৫	২৬.৯২	১.৭৩	১৪.৩৩	৮.১৭	৪৯.৬৩	৪.৬৮	৪.৬৫
১৯৯৬-২০০০	২৪.৫২	৪.৮৯	১৫.৯১	৫.৬৭	৪৯.৯৯	৫.৫৯	৫.৩৪
২০০১-২০০৫	২২.৬৬	২.৮৬	১৬.৪৪	৭.৬৪	৫১.১৯	৬.১৩	৫.৭১
২০০৬-২০১০	২০.৩৭	৫.০৫	১৮.২০	৭.৯২	৫১.৭৮	৫.৮২	৬.০৭
২০১১-২০১৫	১৬.৪৫	৩.৩০	২৭.৮৭	৯.০৬	৫৩.৫৯	৫.৮৬	৬.৩২
২০১৬-২০১৮	১৪.০৮	২.৯৪	২৭.৩১	১১.১০	৫৩.৬২	৬.৪২	৭.৪৩

উৎস: পরিসংখ্যানগত পরিশিষ্ট (Annex) থেকে গণনা করা হয়েছে [ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০১৬)]

সারণি ২ থেকে দেখা যায়, শিল্প এবং সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির হার কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির হারের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি, যা শিল্প খাতে প্রাথমিক বছরগুলোতে সেবা খাতের তুলনায় বেশি ছিল। পরবর্তী বছরগুলোতে সেবা খাত তুলনামূলকভাবে দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সেবা খাতের সাম্প্রতিক উচ্চ প্রবৃদ্ধির পেছনে বেশ কিছু কারণ বিদ্যমান। যেহেতু সেবাখাতে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে এবং একটা প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অনেক সহায়ক কার্যকলাপ ব্যাপকভাবে সেবাখাতে আউটসোর্সিং শুরু হয়েছে যা সেবা খাতের প্রবৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও সেবাখাতের কর্মকাণ্ডগুলোকে অনেক ক্ষেত্রেই 'অবশিষ্ট শ্রেণি' (residual category) হিসেবে গণ্য করা হয়। এর মধ্যে জাতীয় আয় ব্যবস্থাপনায় বেশ কয়েকটি পারিবারিক (household) এবং কুটির/মাইক্রো উৎপাদন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাসত্ত্বেও বাংলাদেশে সেবা খাতের দ্রুততর প্রবৃদ্ধির গতি বিদ্যমান-এটাই বাস্তবতা।

ফলে বর্তমানে সেবা খাত বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সেবা খাতে উৎপন্ন হয় এটা বলা যেতে পারে। এটাও লক্ষ করা যায় যে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কাঠামোগত রূপান্তরের এই ধরনটি বর্তমানে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশিরভাগ অগ্রসর অর্থনীতির ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত ঐতিহ্যগত প্যাটার্ন থেকে অনেকটাই ভিন্নতর। এই অর্থনীতিগুলো প্রথমত প্রাথমিক (কৃষি) থেকে মাধ্যমিক (শিল্প) খাতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং এসব দেশের উন্নয়নের একটি উচ্চতর পর্যায়ে সেবা খাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কাঠামোগত রূপান্তরের এই ধরনের প্রবণতা ক্রমবর্ধমান শ্রমশক্তিকে কৃষি থেকে শিল্পে স্থানান্তর করতে সক্ষম হয় কিন্তু বাংলাদেশে এই ধরনের শ্রম স্থানান্তর ঘটেনি। প্রবন্ধের পরবর্তী আলোচনায় এ বিষয়টি বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হবে, কারণ বাংলাদেশে শিল্প খাত ক্রমবর্ধমান শ্রমশক্তির কর্মসংস্থানের জন্য দ্রুত প্রসারিত হতে পারেনি। এর ফলস্বরূপ অদক্ষ গ্রামীণ শ্রমশক্তি শ্রমনিবিড় কৃষিতে নিয়োজিত থাকতে বাধ্য হয়েছে এবং শ্রমশক্তির যে অংশ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য কারণে কৃষিখাত থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে, তারা শহুরে অনানুষ্ঠানিক সেবাখাত বা অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রমে (যেমন বস্তিতে বিভিন্ন স্বল্প আয়ের পেশা) অংশ নিয়ে জীবিকা নির্বাহে নিয়োজিত হয়েছে। এ কারণে বাংলাদেশের জিডিপিতে সেবা খাতের অবদানের দ্রুত প্রবৃদ্ধি উন্নত দেশগুলোর তুলনায় মাথাপিছু আয়ের অনেক কম স্তরে ঘটেছে। বর্তমানের উন্নত দেশগুলো যখন একই ধরনের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল, তখন তাদের মাথাপিছু আয়ের স্তর অনেক উঁচু ছিল। প্রবৃদ্ধির এই প্যাটার্ন সম্ভবত দারিদ্র্য ও বেকারত্ব এবং দেশে শিল্পের (*ম্যানুফ্যাকচারিং*) অপর্যাপ্ত প্রবৃদ্ধির মধ্যে একটা যোগসূত্রের ফলস্বরূপ এমন একটা সম্ভাবনার দিকে দিক নির্দেশ করে।

২.২। কাঠামোগত রূপান্তর, ১৯৭১-২০২১

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের কাঠামোগত রূপান্তরের যে ধারা তা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশ করে যা সাম্প্রতিক দশকগুলোতে আরও ত্বরান্বিত হয়েছে এবং এর ফলে একই সাথে বেশ কিছু গুণগত পরিবর্তনও ঘটেছে। আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, বেশ কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা যায়: (ক) বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত উৎপাদনের কাঠামোগত

রূপান্তর এবং এই রূপান্তরের দীর্ঘমেয়াদি ধারা, বিরতি (breaks) এবং আউটপুটে কাঠামোগত রূপান্তরের প্রকৃতি; (খ) ম্যানুফ্যাকচারিং প্রবৃদ্ধির পূর্বেই সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির 'বিচ্যুত' প্যাটার্ন এবং দীর্ঘমেয়াদে উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য এর কি প্রভাব হতে পারে তার বিশ্লেষণ; (গ) শিল্প এবং সেবা খাতের মধ্যে বিভিন্ন উপ-খাতের প্রবৃদ্ধির প্যাটার্নের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব; এবং (ঘ) বৈদেশিক বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানের কাঠামোর পরিবর্তন।

বাংলাদেশে অর্থনীতির মোট মূল্য সংযোজনে কৃষির মূল্য সংযোজনের অনুপাত ১৯৪০-এর দশকের ৭০ শতাংশ থেকে ২০০০-এর দশকে মাত্র ১৮ শতাংশে ক্রমাগত হ্রাসের প্রবণতা সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান (সারণি ৩)। অন্যদিকে একই সময়ে শিল্পের অবদান ৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সেবা খাতেও আপেক্ষিক শেয়ারে উচ্চ প্রবৃদ্ধি হয়েছে- একই সময়ের মধ্যে ২৬ শতাংশ থেকে ৫২ শতাংশে। ফলস্বরূপ সেবা খাত উৎপাদনের দিক থেকে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী অর্থনৈতিক খাত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বিশেষ করে ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা, ক্ষুদ্রঋণ, পরিবহণ ও যোগাযোগ, পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য এবং রিয়েল এস্টেট ও হাউজিং সেবার সম্প্রসারণ এই খাতের দ্রুত প্রবৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে।

সারণি ৩: বাংলাদেশে প্রধান খাত সমূহের মূল্য সংযোজনে গড় শেয়ার (শতাংশ)

	কৃষি	শিল্প	সেবা	মোট
১৯৪১-১৯৫০	৭০	৪	২৬	১০০
১৯৫১-১৯৬০	৬২	৫	৩৩	১০০
১৯৬১-১৯৭০	৫৫	১০	৩৫	১০০
১৯৭১-১৯৮০	৪৪	১১	৪৫	১০০
১৯৮১-১৯৯০	৩২	১২	৫৬	১০০
১৯৯১-২০০০	২৫	১৫	৬০	১০০
২০০১-২০১১	১৮	৩০	৫২	১০০

উৎস: বিবিএস, পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ এবং আদমশুমারি প্রতিবেদন, বিভিন্ন বছর।

ISIC (সংশোধন ৩) অনুসারে, ব্যবসায়িক (tradable) সেবাগুলো হচ্ছে পরিবহণ, স্টোরেজ এবং যোগাযোগ, আর্থিক মধ্যস্থতা, এবং রিয়েল এস্টেট আর অ-ব্যবসাযোগ্য (nontradable) সেবাগুলোর মধ্যে রয়েছে পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, হোটেল ও রেস্তোরাঁ এবং অন্যান্য কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবাগুলো। অন্যদিকে নন-মার্কেট সেবাগুলো হচ্ছে জনপ্রশাসন এবং প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক কার্যক্রম। সারণি ৪-এ ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন উপখাতের কার্যক্রমে সংযোজিত মূল্যের আপেক্ষিক অনুপাতের যে পরিবর্তন হয়েছে তা দেখা যেতে পারে।

সারণি ৪: জিডিপিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন উপখাতের কার্যক্রমে সংযোজিত মূল্যের শেয়ার এর পরিবর্তন

	জিডিপিতে % শেয়ার				
	১৯৭৫	১৯৮৫	১৯৯৫	২০০৫	২০১৭
কৃষি	৫৯.০০	৩২.০১	২৫.৩৩	২০.১৮	১৪.১৭
শিল্প	১০.০০	২০.৯৪	২৩.৫৮	২৫.৫২	২৯.৩২
ম্যানুফ্যাকচারিং	৭.০০	১৩.৮৩	১৪.৭২	১৫.৪৭	১৮.২৮
নন-ম্যানুফ্যাকচারিং	৩.০০	৭.১১	৮.৮৬	১০.০৫	১১.০৪
সেবা	৩১.০০	৪৭.০৫	৫১.০৯	৫৪.৩০	৫৬.৫১
ব্যবসায়িক সেবা	১৪.০০	১৮.৩৯	১৮.৯৩	২০.১৯	২১.৬৪
নন-ট্রেডেবল সেবা	১৪.০০	২০.৮৫	২১.৫২	২২.৯৩	২৫.৫৪
নন-মার্কেট সেবা	৩.০০	৫.৪৮	৬.৬৫	৭.১১	৯.৩১

উৎস: পরিকল্পনা কমিশন, ২০১১। পৃ. ১৩-১৮ [ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (পর্ব-৩) এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১৬। পৃ.৩৯৯, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ২০১৫]।

সারণি থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশ সফলভাবে জিডিপিতে ক্রমবর্ধমান ম্যানুফ্যাকচারিং শেয়ার বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে যা বর্তমান সময়ের বেশ কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশের কম বা ক্রমহ্রাসমান শেয়ারের সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখায়। বাংলাদেশের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবস্থান ১৯৭৫ সালের ৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ১৮ শতাংশের বেশি হয়েছে। অন্যদিকে একই সময়ে নন-ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের অবস্থান ৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১১ শতাংশের বেশি হয়েছে।

১৯৮০–এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ম্যানুফ্যাকচারিং উপখাত শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে শুরু করে এবং ধারাবাহিকভাবে জিডিপিতে এর অংশ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। সেবা খাতেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। তবে শিল্পখাতের শেয়ার বৃদ্ধি পেলেও সেবাখাতের শেয়ারের দ্রুত বৃদ্ধির কারণে জিডিপিতে সেবাখাতের শেয়ার শিল্প খাতের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। সেবার ক্ষেত্রে ১৯৭৫ সালে বাণিজ্যিক এবং অ-বাণিজ্যিক সেবাগুলোর প্রতিটির ক্ষেত্রে ১৪ শতাংশের মতো শেয়ার ছিল, কিন্তু অ-বাণিজ্যিক সেবার শেয়ার ২০১৭ সালে চার শতাংশেরও বেশি পয়েন্টে লেনদেনযোগ্য সেবার শেয়ারকে ছাড়িয়ে গেছে। ২০১৭ সালে নন-মার্কেট সেবার শেয়ার ১৯৭৫ সালের ৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯ শতাংশের বেশি হয়েছে।

উপরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, কৃষি খাতের ক্রমহ্রাসমান শেয়ারের সাথে সাথে বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর ম্যানুফ্যাকচারিং এবং সেবা উভয় খাতের শেয়ার বৃদ্ধি করেছে তবে সেবা খাতের অবদান শিল্প খাতের অবদানের তুলনায় অনেকটাই বেশি। এ ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তন আরও কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশে বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে পরিলক্ষিত হয় যা অপরিপক্ব (premature) শিল্পায়ন সংশ্লিষ্ট উদ্বেগের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

২.৩। কর্মসংস্থানের খাতভিত্তিক শেয়ারে পরিবর্তন

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বাংলাদেশ জনমিতিক লভ্যাংশ (demographic dividend) থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হয়েছে যার ফলে নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত কমেছে এবং কর্মক্ষম বয়সের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলস্বরূপ শ্রম উপার্জন দারিদ্র্য হ্রাসে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে ২০০০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে এবং কৃষি আয়ও বৃদ্ধি পায় (World Bank, 2013)। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের অর্থনীতি ২০০৩ সাল থেকে প্রতি বছর ১.১৫ মিলিয়নেরও বেশি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে, যেখানে কর্মক্ষম জনসংখ্যার (বয়স ১৫-৬৪) মধ্যে মোট কর্মসংস্থান বার্ষিক ২.৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে (BBS, Labour Force Survey, 2003, 2017)। এই সময়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হারও কর্মক্ষম জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি ছিল। তদুপরি একই সময়ে অকৃষি কর্মসংস্থান দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেয়েছে (প্রতি বছর ৩.৭ শতাংশ) এবং মজুরি কর্মসংস্থান (wage employment) বার্ষিক ৫.৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে যার বেশিরভাগই শহুরে এলাকায় ম্যানুফ্যাকচারিং কাজের সাথে জড়িত। শহুরে ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মসংস্থানের এই বৃদ্ধি নারী কর্মসংস্থানে বার্ষিক ৪.৪ শতাংশ বৃদ্ধিতেও অবদান রেখেছে, যা লাখ লাখ নারীকে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণে সহায়তা করেছে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি মজুরি কর্মীদের মধ্যে প্রকৃত মজুরি বার্ষিক ৪.৯ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে (Farole et al., 2017)।

কাঠামোগত রূপান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে এই যে জিডিপিতে কৃষির আনুপাতিক অবদান হ্রাস পাবে আর এটিই বাংলাদেশে ঘটেছে। তবে কর্মসংস্থানে কৃষির শেয়ার এখনও বেশি। ১৯৬০ সালে জিডিপিতে কৃষির অবদান ছিল সর্বোচ্চ ৫৮ শতাংশ; যা ২০১৯ সালে ১৩ শতাংশে নেমে আসে (সারণি ৫)। ২০১৯ সালে কর্মসংস্থানে কৃষির অবস্থান ছিল প্রায় ৪০ শতাংশ, যা ১৯৬০ সালে ছিল ৫৩ শতাংশ যদিও এটি ১৯৯০ সালে সর্বোচ্চ ৬৮ শতাংশে পৌঁছেছিল।

সারণি ৫: বাংলাদেশের জিডিপি এবং কর্মসংস্থানে বিভিন্ন খাতের অবস্থান

	১৯৬০	১৯৭০	১৯৮০	১৯৯০	২০০০	২০১০	২০১৫	২০১৯
জিডিপিতে অবস্থান (%)								
কৃষি	৫৭.৫	৫৪.৬	৩২.৮	৩০.৫	২২.৭	১৭.০	১৪.৮	১৩.১
শিল্প	৬.৯	৮.৭	২২.৮	২২.৮	২৬.৭	২৯.৫	৩১.৫	৩৩.১
সেবা	৩৫.৬	৩৬.৭	৪৪.৬	৪৬.৭	৫০.৬	৫৩.৫	৫৩.৭	৫৩.৮
কর্মসংস্থানে অবস্থান (%)								
কৃষি	৫৩.০	৬৩.৫	৪৭.৮	৬৮.২	৬১.০	৪৭.৩	৪৩.৫	৩৯.৭
শিল্প	১১.০	১০.০	১৬.০	১৫.৬	১৫.২	১৭.৬	১৯.৯	২০.৫
সেবা	৩৬.০	২৬.৫	২৪.২	১৬.২	২৩.৮	৩৫.১	৩৬.৬	৩৯.৮

উৎস: বিশ্ব উন্নয়ন সূচক।

উপরের তথ্য থেকে দেখা যায়, কৃষিতে কর্মসংস্থানের অবস্থান হ্রাস পাচ্ছে তবে তা জিডিপিতে কৃষির অবদানের তুলনায় ধীর গতিতে। কর্মসংস্থানে শিল্পের অবস্থান বেশি নয়। কৃষিতে ৪০ শতাংশ কর্মসংস্থানের সাথে সাথে আরও ৪০ শতাংশ সেবা খাতে নিয়োজিত এবং বাকি ২০ শতাংশ শিল্প খাতে, বিশেষ করে

ম্যানুফ্যাকচারিং এবং নির্মাণ সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে। বাংলাদেশে সেবা খাতটি অত্যধিক অনানুষ্ঠানিক খাত ভিত্তিক আর এজন্য এ খাতটি স্বল্প মুজুরির কম-উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের যোগান দেয়।

কর্মসংস্থানের লিঙ্গ বিভাজনও লক্ষণীয়। কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ পুরুষের তুলনায় যথেষ্ট বেশি। অধিকন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং-এ নারীর কর্মসংস্থানের অনুপাত দ্বিগুণ হয়েছে (মূলত তৈরি পোশাক এবং অনুরূপ শিল্পের প্রসারের কারণে) এবং তা পুরুষদের তুলনায় বেশি হয়েছে। তবে সেবা খাতে উল্লেখযোগ্য লিঙ্গ বৈষম্য বিদ্যমান, ফলে নারীদের অবস্থান অনেক কম। এটি মূলত হয়ে থাকে পরিবহণ এবং পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায় নারীদের কম অংশগ্রহণের কারণে (সারণি ৬)।

সারণি ৬: বিভিন্ন খাতের কর্মসংস্থানের লিঙ্গ বিভাজন

	২০০০		২০১০		২০১৩		২০১৭	
	নিজ নিজ মোট নিয়োজিত শ্রমের %							
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
কৃষি	৫১.৯	৪৬.২	৪০.২	৬৪.৮	৪১.৭	৫৩.৫	৩২.২	৫৯.৭
শিল্প	১১.৪	২০.০	১৮.৭	১৩.৩	১৯.৬	২৩.৭	২২.০	১৬.৯
সেবা	৩৬.৭	৩৩.৮	৪১.১	২১.৯	৩৮.৭	২২.৮	৪৫.৮	২৩.৪
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

উৎস: বিবিএস, শ্রমশক্তি সারণি, বিভিন্ন বছর।

সামগ্রিকভাবে কাঠামোগত রূপান্তরের ফলস্বরূপ নিম্ন উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড থেকে উচ্চ উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। অতএব এক্ষেত্রে মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে: বাংলাদেশ কীভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে অর্থনীতিকে কমমূল্য সংযোজন কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা থেকে উচ্চ মূল্য সংযোজন কার্যক্রমে রূপান্তরিত করতে পারে? এখানে দুটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রথমত, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক হলেও এই প্রবৃদ্ধির সামগ্রিক কর্মসংস্থান ক্ষমতা কম যদিও রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকশিল্পে এই সময়ে উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ শুধুমাত্র কর্মসংস্থানের মাত্রা নয় বরং এটি নিম্ন থেকে উচ্চ উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে শ্রম স্থানান্তরের সাথেও সম্পর্কিত।

২.৪। বাংলাদেশের কাঠামোগত রূপান্তরের বৈশিষ্ট্য

স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে বাংলাদেশের কাঠামোগত রূপান্তর প্রক্রিয়ার বেশ কিছু স্বতন্ত্র লক্ষ করা যায়। যেমনটি ঐতিহ্যগতভাবে ঘটে, সামগ্রিকভাবে প্রথম পর্যায়ে শ্রমশক্তি কৃষি থেকে ম্যানুফ্যাকচারিং এবং সেবা খাতে স্থানান্তরিত হয়নি; এবং পরবর্তী পর্যায়ে কৃষি এবং ম্যানুফ্যাকচারিং থেকে সেবা খাতে শ্রম স্থানান্তরিত হয়নি (Echevarria, 1997)। দেখা যায়, বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে কম মাথাপিছু আয়ে সেবা খাতে উৎপাদনের শেয়ার বৃদ্ধি পেয়েছে।

সেক্টরাল পর্যায়ে স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের কৃষি আধুনিকীকরণের গতিপথ তুলনামূলকভাবে দ্রুত হয়েছে, যার ফলে মাত্র ১৫ বছরে (১৯৯০ এবং ২০১০ সালের মাঝামাঝি সময়ে) বাংলাদেশ

একটি কৃষিভিত্তিক দেশ থেকে একটি উত্তরণশীল (transition) দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলাদেশের এই পরিবর্তনটি চীনের অনুরূপ পরিবর্তনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যা ঘটেছিল ১৯৮০ এবং ২০০০ এর মাঝামাঝি সময়ে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের কৃষি আধুনিকীকরণ মডেল রাসায়নিকীকরণ এবং যান্ত্রিকীকরণের একটি ক্রমকে চিহ্নিত করে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর সবুজ বিপ্লবের (green revolution) একটি সফল ভূমি-সংরক্ষণকারী প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ঘটে বাংলাদেশের কৃষিতে, যা উচ্চ ফলনশীল এবং উন্নত জাতের বীজ (ধান ও গম) দ্বারা প্রভাবিত ইনপুট-ভিত্তিক উৎপাদনকে প্রসারিত করার একটি প্রক্রিয়া ছিল। বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকেরা ১৯৭০ সাল থেকে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে এই কৃষি রূপান্তরের সূচনা করেন। যান্ত্রিকীকরণ কিন্তু পরবর্তীতে মূলধনের তীব্রতা কৃষিতে নিয়ে এসেছে, যখন রাসায়নিকীকরণ কৃষকদের রাসায়নিক সার ব্যবহার এবং অন্যান্য আধুনিক ইনপুটগুলির প্রয়োগ ক্ষমতা ও দক্ষতা উভয়ই বাড়িয়েছে যা কৃষকদের জমির ইউনিট প্রতি উচ্চ মাত্রার আউটপুট উৎপাদন করার ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম করেছে।

বাংলাদেশে শিল্পায়নের প্যাটার্ন নগরায়ণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যার সাথে অনেকগুলো কারণ জড়িত যেমন বৈদেশিক বাজারের চাহিদা (রপ্তানিমুখী ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্য), উৎপাদন ইনপুটের অভ্যন্তরীণ সরবরাহ (স্বল্প মজুরির দক্ষ শ্রম এবং অবকাঠামো সেবা), পক্ষপাতদুষ্ট নীতি, প্রাইমেট শহরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং গ্রামীণ এলাকা থেকে ভালো সুযোগের সন্ধানে শ্রমের স্থানান্তর। অধিকন্তু শিল্পায়ন-প্ররোচিত প্রবৃদ্ধির 'স্পিলওভার' (spillover) প্রভাবগুলি স্থানীয় সরবরাহকারীদের শহরসমূহে একত্রিত হতে এবং অনানুষ্ঠানিক উৎপাদন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হতে উৎসাহিত করে শহরগুলিতে শ্রম পুঞ্জীকরণ প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করেছিল। যাতায়াত খরচ সাশ্রয় করার লক্ষ্যে শহরতলি এলাকায় নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর ঘনত্ব এই সমস্ত এলাকায় ছোট ও অনানুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডগুলোকেও আকৃষ্ট করেছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলাদেশে নগর বৃদ্ধির গতিশীলতা বেশ কয়েকটি কৌশলগত শিল্প খাত (পোশাক শিল্প সহ) দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

এছাড়াও শহুরে জীবন, জীবিকা এবং পরিবেশের ওপর প্রভাব শিল্পায়নের প্রকৃতির পাশাপাশি বৃহত্তর প্রবৃদ্ধি নিয়ামকগুলোর সাথে দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। অন্যদিকে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর সক্ষম নিয়ন্ত্রণের অভাব এবং অন্যান্য সীমাবদ্ধতা এ সকল প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত নেতিবাচক বাহ্যিকতাগুলোকে তীব্রতর করার একটা প্রক্রিয়াও শুরু করেছিল, যার ফলে জীবনযাত্রার মানের ওপর বিরূপ প্রভাব, পরিবেশের অবনতি, সামাজিক অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কুফল লক্ষণীয় হয়। এই বিশেষধারা 'উৎপাদন শহর প্যারাডাইম' (production cities paradigm) এর সাথে বেশি সম্পর্কিত এবং যা অনেকটাই 'ভোগের শহর প্যারাডাইম' (consumption cities paradigm) এর সাথে অসাদৃশ্যপূর্ণ।

অন্যদিকে সেবা খাতটি হচ্ছে অত্যন্ত ভিন্নধর্মী যা বাণিজ্যযোগ্য এবং অ-বাণিজ্যযোগ্য উভয় অংশের সাথে সংশ্লিষ্ট। বিভিন্ন খাতভিত্তিক টোটাল ফ্যাক্টর প্রোডাক্টিভিটি (TFP) এর তুলনা থেকে দেখা যায়, কৃষি খাতে সর্বনিম্ন উৎপাদনশীলতা বিরাজমান; তারপরে রয়েছে সেবা খাত এবং সবচেয়ে বেশি উৎপাদনশীলতা ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে। যদিও সেক্টরাল TFP বৃদ্ধির পার্থক্য শ্রম পুনর্বণ্টনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে, কিন্তু এ ধরনের পুনর্বণ্টন শ্রমবাজারে বিকৃতি এবং সেক্টরাল উৎপাদনশীলতার মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার ফলাফল দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

৩। প্রবৃদ্ধি এবং কাঠামোগত রূপান্তরের গতিশীলতা বিশ্লেষণ

৩.১। মাইক্রো ফাউন্ডেশনের ভূমিকা

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেশ কয়েকটি বিরতি (breaks) এবং টার্নিং পয়েন্ট (turning point) দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তদনুসারে প্রবৃদ্ধির হার এবং কাঠামোগত রূপান্তরের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়গুলি চিহ্নিত করা যেতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি বিশ্লেষণ করার সময় স্বল্পমেয়াদি ওঠানামা তুলে ধরা খুব অর্থপূর্ণ নয় কিন্তু একই সময়ে প্রধান ঘটনা বা টার্নিং পয়েন্টগুলিকে উপেক্ষা করে পুরো সময়কালে বৃদ্ধির গতিশীলতা নিয়ে আলোচনা করাও বাস্তবসম্মত বা বিশ্লেষণাত্মক অর্থবহ হয় না। ফলে এ ধরনের বিশ্লেষণ থেকে প্রবৃদ্ধির বাধা বা চালিকাশক্তি সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা দুষ্কর হয়ে পড়ে।

১৯৮০- এর শেষের দিক থেকে অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রবর্তনকে প্রায়ই বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর অর্থনৈতিক ইতিহাসে একটি প্রধান বাঁক হিসেবে দেখা হয়, যা 'নিম্ন প্রবৃদ্ধির ফাঁদ' থেকে বিরতি প্রদান করে যেখানে অর্থনীতি ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে ধরা পড়েছিল (Mujeri & Sen, 2006)। ১৯৯০- এর দশকে অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে যে উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধির ধারা শুরু হয়েছিল এবং তারপরে টিকে ছিল তা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জনগুলোর মধ্যে একটি। তবে একথা বলা যায় যে, বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যে নীতিগুলো শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সচেষ্ট হয়, সেগুলির ক্ষেত্রে গুরুতর বিশ্লেষণাত্মক ঘাটতি বিদ্যমান থাকে কারণ বাংলাদেশের উন্নয়ন লক্ষ্য শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন নয়। ফলে এ ধরনের একরৈখিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য বাংলাদেশকে একটি সরল এবং অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর কাঠামোর দিকে নিয়ে যেতে পারে যা উন্নয়নের বৃহত্তর লক্ষ্যগুলিকে উপেক্ষা করতে পারে যা বাংলাদেশের জন্য কাম্য নয়।

এরপরও একথা অনস্বীকার্য যে, উন্নয়নের জন্য মানবিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন বাংলাদেশের জন্য একটি বড় ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই ১৯৯০ এর দশকের শেষের দিক থেকে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে এবং টোটাল ফ্যাক্টর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, বৃহত্তর উন্মুক্ততা, মানব পুঁজির প্রাপ্যতা, সেবা খাতের উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং অন্যান্য চাহিদা চালিত কার্যক্রমের মাধ্যমে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের দিকেও অগ্রসর হয়েছে।

বিগত চার দশকের প্রবৃদ্ধির উৎসগুলি মূলত ফ্যাক্টর সঞ্চয়নের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে, অর্থাৎ উচ্চ বিনিয়োগ এবং অতিরিক্ত শ্রমের ব্যবহারের মাধ্যমে। বাস্তবে ১৯৮০ এর দশকের শেষ দিক থেকে জিডিপির সাথে বিনিয়োগের অনুপাত ক্রমাগতভাবে বেড়েছে। শ্রমের বৃহত্তর প্রাপ্যতার কারণে বাংলাদেশে শ্রমের ইউনিট প্রতি মূলধনের যোগান তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এই ধরনের পরিস্থিতিতে অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশ নিম্ন-প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার শিকার হয়; তবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে শ্রম প্রাপ্যতার উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিদ্যমান।

১৯৮০ এর দশক থেকে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমাগত হ্রাস পেতে শুরু করে; কিন্তু কর্মজীবী জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে যা আগের দশকগুলোর উচ্চহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফসল। এর ফলে মোট জনসংখ্যার সাথে কর্মক্ষম বয়সের জনসংখ্যার অনুপাতের পরিবর্তনও ১৯৯০ সাল থেকে

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে শুরু করে। এটি এ ইঙ্গিত দেয় যে, বাংলাদেশ সাম্প্রতিক দশকগুলিতে অতীতের জনসংখ্যা বিস্ফোরণের জনমিতিক লভ্যাংশ (demographic dividend) ভোগ করতে সক্ষম হচ্ছে। অধিকন্তু বাংলাদেশের শ্রমবাজারে অধিক সংখ্যক নারী শ্রমের আগমনের সাথে সাথে একটি বড় গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তনেরও সূচনা হয়েছে। সাম্প্রতিক দশকগুলিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কর্মক্ষম জনশক্তির মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধির দ্বারা চালিত হয়েছে, যাকে শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির নির্দেশক হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। এছাড়া মানবসম্পদ খাতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি যেমন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে অধিকতর ব্যয়ও এসব ফলাফলকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা দেখায়, মানব পুঁজি বিকাশের প্রচেষ্টা এমনকি উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়েও প্রবৃদ্ধির ওপর ইতিবাচক ও উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে, বিশেষ করে যখন এগুলো উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে যদিও দেশের বিস্তৃত অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির এ ধরনের লিঙ্কগুলি অত্যন্ত জটিল এবং সহজবোধ্য নয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাথমিক বিকাশের সময়কালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মূলত মূলধন পুঞ্জিভূতকরণ এবং পরিমাণগত সম্প্রসারণ এবং কিছু পরিমাণে শ্রমের গুণমান বৃদ্ধি দ্বারা চালিত হয়েছে যেখানে মানব পুঁজি এবং প্রযুক্তিগত উন্নতির ভূমিকা ছিল অপেক্ষাকৃত নগণ্য। তবে এনজিও-এমএফআই (NGO-MFIs) সহ স্থানীয় পর্যায়ের সংস্থাগুলির শক্তিশালী উপস্থিতির মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য একটি ইতিবাচক চ্যানেলের উদ্ভব ঘটে যা পরবর্তীতে উদ্ভাবনী কর্মসূচির আপ-স্কেলিং (up scaling) এবং নতুন ধারণার প্রসারের ক্ষেত্রে একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে উদ্ভূত হয়। গ্রামীণ রাস্তা এবং যোগাযোগ সুবিধার একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্কের উপস্থিতিতে বসতিগুলির ঘনত্ব এবং তাদের অবস্থানগত ঘনিষ্ঠতা বিশেষ করে গ্রামীণ নারীদের জন্য সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ও গতিশীলতা প্রসারের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী চ্যানেল হিসেবেও আবির্ভূত হয়। এছাড়াও CMSMEs বিকাশের অর্থনৈতিক প্রভাব এবং নারী সংহতি বৃদ্ধিকারী এজেন্সি, ক্ষমতায়ন এবং পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য অ-অর্থনৈতিক লাভও অর্জিত হয় যা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডগুলোকে আরও কার্যকরভাবে সম্পাদনের জন্য যে সামাজিক পরিবেশ প্রয়োজন তা তৈরিকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

বাস্তবে উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো অনেকটাই বিস্তৃত ছিল, যেহেতু এনজিও-এমএফআইগুলো প্রাথমিকভাবে দরিদ্রদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে এবং প্রত্যন্ত ও সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলে তাদের কর্মকাণ্ড শুরু করে যার ফলে বেশকিছু সমস্যা সমাধানের সাশ্রয়ী পন্থাও উদ্ভাবিত হয়। এই হস্তক্ষেপগুলি দরিদ্রদের জন্য মিতব্যয়ী ও দরিদ্রবান্ধব কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতেও সহায়তা করেছিল, যেমন দ্রুত বর্ধনশীল তৈরি পোশাক শিল্পে যাতে গ্রামীণ এলাকার নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। সামগ্রিকভাবে এ ধরনের বিভিন্ন উদ্ভাবনী কার্যকলাপের মাধ্যমে উন্নয়নের একটি নতুন ধারার উদ্ভব হয় যা আচরণগত পরিবর্তন ও মাইক্রো পর্যায়ে নানা ধরনের পরিবর্তনের সূচনা করে এবং সামাজিক রূপান্তরের একটি বিস্তৃত প্রক্রিয়ার ভিত্তিসহ প্রারম্ভিক যাত্রাপথ নির্ধারণ করে। প্রবৃদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে এর মধ্যে রয়েছে নারীদের কর্মসংস্থানের প্রতি মনোভাব, উর্বরতা সংক্রান্ত (fertility) আচরণ এবং শিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় বিনিয়োগের জন্য পিতামাতার প্রণোদনার প্রসার (Mahmud, 2008)।

অনেক উদ্ভাবনী কল্যাণমুখী কর্মসূচির জন্য সরকারের নীতি এবং সমর্থনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচি ১৯৯০ এর দশকের গোড়ার দিক থেকে দরিদ্র গ্রামীণ পরিবারের শিশুদের আনুষ্ঠানিক স্কুল ব্যবস্থায় নিয়ে আসতে সহায়তা প্রদান শুরু করে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সার্বজনীন উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু করার মাধ্যমে বালিকা বিদ্যালয়ে তালিকাভুক্তি (enrollment) বৃদ্ধির কর্মসূচি কিশোরী মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর বিষয়ে পিতামাতার মনোভাব পরিবর্তন এবং সামাজিক-বাধাসমূহ দূরীকরণে বিস্তৃত প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। যদিও এসব কর্মসূচির অনেকগুলো দুর্নীতি, পৃষ্ঠপোষকতার রাজনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে, কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে এগুলোর ব্যাপকতা এবং জনপ্রিয়তা তৎকালের সকল সরকারের আমলেই সামাজিক বৈধতা অর্জন করেছিল এবং বিস্তৃত সামাজিক পরিবর্তনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

স্পষ্টতই, একথা পরিষ্কার যে, এই ধরনের অপ্রচলিত উদ্ভাবনগুলির মধ্যে অনেকগুলিই ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পূর্বের ন্যায় কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়তো সম্ভবপর হবে না অথবা ভবিষ্যতে টেকসইও হবে না। তবে বর্তমানে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির উন্নয়নের যে প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং একই সঙ্গে আউটসোর্সিং ও আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে নতুন শিল্প ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট উন্নয়নের সুযোগ ও সম্ভাবনা আয়ত্ত করার যে অপার সম্ভাবনা বাংলাদেশের সম্মুখে উন্মুক্ত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতের জন্য আশার চিহ্ন। তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে, ধনী দেশগুলো অনেক সময় বিশ্ব অর্থনীতির বিকাশ ও সুষম বিশ্বায়নের পথে হুমকি সৃষ্টি করে নিজ স্বার্থে যা বর্তমানে বাংলাদেশের মতো নতুন শিল্পোদ্যোগী দেশগুলোর জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে তাদের উন্নয়ন যাত্রায়। তবে এ কথাও সত্য যে, এই ধরনের বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্বায়নের ধারার মধ্য থেকেই ভবিষ্যতের জন্য বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নতুন চালকগুলো নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে। এজন্য বিগত সময়ের যে উন্নয়ন ধারা সেটাই যে বাংলাদেশের ভবিষ্যতে উন্নয়ন যাত্রাপথ নির্ধারণ করবে এ ধারণা একটি ভালো নির্দেশিকা নাও হতে পারে।

এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশ অর্থনীতির নিয়ত পরিবর্তনশীল গতিশীলতার মধ্যে কি ধরনের উন্নয়ন মডেল বাস্তবসম্মতভাবে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। একথা সত্য যে, আগামী দিনগুলোতে উন্নয়নের জন্য সাশ্রয়ী সমাধানগুলোর তুলনায় বাংলাদেশকে ক্রমবর্ধমানভাবে সরকারের সামাজিক ব্যয় (public social spending) এবং সার্ভিস ডেলিভারি ব্যবস্থার উন্নতির ওপর নির্ভর করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, শিশুমৃত্যুর হার আরও হ্রাসের জন্য ব্যয়বহুল শিশুমৃত্যু রোধকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হবে, যেমন হাসপাতালভিত্তিক সেবা ও জন্ম-সম্পর্কিত জটিলতার কারণে নবজাতকের মৃত্যু এড়ানো। একইভাবে বিদ্যমান উচ্চ মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস করতে তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাও প্রয়োজন। এটাও সত্য যে, বর্তমান নিম্নমানের শিক্ষা বিদ্যালয়ের তালিকাভুক্তির বর্তমান সুফলগুলোকে ধরে রাখতে সক্ষম হবে না আগামী দিনগুলোতে যা বর্তমানে স্কুল ড্রপ-আউট অর্থাৎ বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার উচ্চ হারে প্রতিফলিত হয়।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে এটা বলা যেতে পারে যে, সামাজিক উন্নয়নের বর্তমান যে ব্যাপক অগ্রগতি তা কিন্তু অনেকাংশে সফলভাবে জনসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্বল শাসনের কারণে সৃষ্ট সমস্যাগুলি বাইপাস (bypass) করার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। এক্ষেত্রে আরও কয়েক ধরনের 'মডেল' ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, টিকাদান এবং গর্ভনিরোধকের সামাজিক বিপণন সেবা সরবরাহের জন্য প্রতিষ্ঠিত কাঠামোর বাইরে এবং এনজিওগুলিকে সম্পৃক্ত করে প্রদান করা হয়েছিল। তবে অনেক ক্ষেত্রেই আরও অগ্রগতি অর্জনের জন্য এই ধরনের পন্থা ব্যবহার করে সফলতা অর্জন ভবিষ্যতে সম্ভবপর নাও হতে পারে। বর্তমানে মূলধারার সেবা সরবরাহ ব্যবস্থাগুলোতে একদিকে যেমন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখার ব্যবস্থা অপ্রতুল অন্যদিকে তেমনি এসব ব্যবস্থা অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত। উদাহরণস্বরূপ বর্তমানে গ্রামীণ পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা সেবার নিম্নমান এবং ডাক্তারদের ব্যাপক অনুপস্থিতি দ্বারা জর্জরিত।

বিকল্প এবং অতীতের সফল হস্তক্ষেপের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেমন এনজিও এবং সিবিওর সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমগুলো ছিল পরিবার বা ব্যক্তি কেন্দ্রিক (বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দরিদ্র মহিলা) যা অনেকটাই জনগণকে সেবা প্রদানের জন্য সৃষ্ট এজেন্সি যেমন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার না করে অর্জিত হয়েছিল (Sen & Dreze, 1995: 190-91)। ফলে এই হস্তক্ষেপগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পারিবারিক কল্যাণের জন্য স্ব-আগ্রহী প্রচারের মাধ্যমে কার্যকর হয়েছে, যদিও সুবিধাগুলিতে 'জনস্বার্থ' (যেমন টিকাদান, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন) উপাদান জড়িত ছিল। এক্ষেত্রে কার্যকর স্থানীয় সরকারের অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশে এনজিও-এমএফআইগুলি 'অকার্যকর' কেন্দ্রীভূত জনসেবা বিতরণ ব্যবস্থার সাথে সমান্তরালভাবে কাজ করেছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, এনজিও-এমএফআইগুলি মানসম্পন্ন পাবলিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে দরিদ্রদের সমর্থনে কার্যকর গোষ্ঠীভিত্তিক সংস্থা হিসেবে কাজ করতে পারে। স্পষ্টতই, বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যগুলোকে আরও সংহত করা এবং আরও বেশি দ্রুততার সাথে অগ্রগতি অর্জন করা। এর জন্য শুধুমাত্র দ্রুত সামাজিক ব্যয় বৃদ্ধি নয়, একই সঙ্গে সেবা প্রদানের শাসন কাঠামোর ব্যাপক উন্নতিও প্রয়োজন। বাংলাদেশের জন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং কম খরচে সাশ্রয়ী সমাধান ব্যবহারকারী সহায়ক সেবা প্রদানে সক্ষম চ্যানেলগুলোকে সচেতনভাবে ব্যবহার করা যাতে স্থানীয় শাসনব্যবস্থার ব্যাপক সীমাবদ্ধতার উপস্থিতিতেও উদ্ভাবনী ক্ষমতার ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

১৯৭০ এর দশকের শুরু থেকেই বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ বিপ্লবের অধীনে 'স্মার্ট' (smart) ঋণ এবং সামাজিক উন্নয়ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে একটি স্ব-নিযুক্ত (self-employed) উদ্যোক্তা শ্রেণি তৈরি হয়েছিল, যাদের বেশিরভাগই মহিলা এবং যারা এর মাধ্যমেই অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রাথমিক রশ্মির দর্শন লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল যা দক্ষিণ এশিয়া বা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে খুব একটা বিরাজমান ছিল না। সময়ের সাথে সাথে ক্ষুদ্রঋণেরও বিবর্তন ঘটেছে, ঋণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঋণগ্রহীতাদের তাদের পছন্দের আয় সৃষ্টিকারী কার্যক্রম এবং/অথবা ক্ষুদ্র উদ্যোগ শুরু করার জন্য 'উপযুক্ত ঋণ' (মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ লোন) প্রদান করা শুরু হয়েছে। এই বিবর্তন বিশেষ করে 'ক্ষমতাপ্রাপ্ত' (empowered) গ্রামীণ নারীদের লাভজনক কর্মসংস্থানে নিযুক্ত হতে এবং বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির ধারায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম করে তুলেছে। ফলস্বরূপ বাংলাদেশ একটি সফল 'প্রবৃদ্ধির গল্প' সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে বিগত পঞ্চাশ বছরে যা অন্যান্য দেশের জন্য রোল মডেল হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। এভাবেই বিচক্ষণ অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করে মাত্র পাঁচ দশকের মধ্যে একটি অতিদরিদ্র

দেশ কীভাবে একটি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হতে পারে তার একটি বিরল উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশ আজ পরিগণিত হচ্ছে।

৩.২। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নীতি-ভিত্তিক পর্যায় (policy-based periodisation) পর্যালোচনা

স্বাধীনতার পর থেকে বিগত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশ বেশ কিছু মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছে, যা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে। এসব পরিবর্তন বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য প্রবৃদ্ধির কিছু স্বতন্ত্র পর্যায় সৃষ্টি করেছে, যা প্রধান অর্থনৈতিক সূচকগুলোর সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির পরিবর্তনগুলোর সাথে সম্পর্কিত। এই প্রবন্ধের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে, নীতিভিত্তিক পর্যায়ক্রম ব্যবহার করে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি-ইতিহাসকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে[২]। প্রবৃদ্ধির পাঁচটি পর্যায় নিম্নরূপঃ

পর্যায় ১; ১৯৭২-১৯৮২- রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে অর্থনীতির পুনর্গঠন এবং পুনরুদ্ধার

পর্যায় ২; ১৯৮৩-১৯৯০- অর্থনীতির ধীর প্রবৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান ম্যাক্রো অস্থিরতা

পর্যায় ৩; ১৯৯১-১৯৯৬- সংকটচালিত সংস্কার এবং অনুকূল প্রাথমিক অবস্থা সৃষ্টি

পর্যায় ৪; ১৯৯৭-২০০৮- অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নয়ন

পর্যায় ৫; ২০০৯-২০২১- অর্থনীতির সুসংহতকরণ এবং প্রবৃদ্ধির ত্বরণ

নির্বাচিত সূচক ব্যবহার করে পাঁচটি পর্যায়ের প্রধান অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি সারণি ৭–এ দেখানো হলো।

[২] পিরিয়ডাইজেশন হলো অতীতকে বিচ্ছিন্ন, পরিমাপকৃত সময়ের গ্রুপে শ্রেণীবদ্ধ করার একটি প্রক্রিয়া। এটি সাধারণত ইতিহাসের অধ্যয়ন এবং বিশ্লেষণের সুবিধার্থে করা হয়, বর্তমান এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াগুলি বোঝার জন্য এবং সেই ঘটনাগুলির সাথে যুক্ত হতে পারে এমন কার্যকারণ নির্ধারণে। যাইহোক, একটি সময়কালের সুনির্দিষ্ট শুরু এবং সমাপ্তি নির্ধারণ প্রায়শই অনুমিত হয়, কারণ এটি সময়ের সাথে সাথে ইতিহাসের গতিপথে পরিবর্তিত হয়েছে। ইতিহাসকে যতটা ধারাবাহিক হিসেবে ধরা হয়, সময়কালও সেরকম হতে পারে। তথাপি ইতিহাসের বিক্ষিপ্ত নীতি বা উন্নয়ন বিশ্লেষণ বোঝার জন্য পর্যায়ক্রম ছাড়া অন্য কাঠামো বিদ্যমান নয় (Besserman, 1996)। বর্তমান বিশ্লেষণটি Mujeri and Sen (2006) থেকে গৃহীত হয়েছে। নীতির মাপকাঠি ব্যবহার করে বাংলাদেশের জন্য উপরোক্ত পিরিয়ডাইজেশন বিশ্লেষণটি অন্যান্য যুক্তিসঙ্গত মানদণ্ডের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেমন 'সংকটের দ্বারা পিরিয়ডাইজেশন' বা 'স্ট্রাকচারাল ব্রেক' ব্যবহার করে পিরিয়ডাইজেশন ।

সারণি ৭: সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচক প্রবৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে

	পর্যায় ১ ১৯৭২–১৯৮২	পর্যায় ২ ১৯৮৩-১৯৯০	পর্যায় ৩ ১৯৯১-১৯৯৬	পর্যায় ৪ ১৯৯৭-২০০৮	পর্যায় ৫ ২০০৯-২০২১
জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার, % প্রতি বছর	২.৩০	৩.৮৬	৪.৫৩	৫.৪০	৬.৬০
মাথাপিছু জিডিপি সূচক, ২০০৬=১০০	৫৪.৬০	৬০.৮৯	৬৮.৩০	৮৮.৯৫	১৪৯.০৬
জিডিপির % হিসেবে					
মোট বিনিয়োগ	১০.৯১	১৬.১১	১৮.২৮	২৩.৪১	২৭.৮৩
মোট জাতীয় সঞ্চয়	৩.৬১	২১.৭৪	২২.১৯	৩০.৬৩	৩৮.১১
রপ্তানি	৫.২৭	২.৬৫	৩.৮৭	৯,৬৮	১৭.৮১
আমদানি	১২.৯৭	৫.৮০	৬.২৮	১৩.৪৩	২১.১৪
রেমিট্যান্স	১.৩৭	২.৭৮	২.৯৮	৫.৪৮	৮.৫৫
মোট সরকারি রাজস্ব	৬.২৭	৬.৩৩	৮.৮৩	৯.৬৬	১১.০৫
মোট সরকারি ব্যয়	১৩.০৪	১২.৭৯	১৩.৭৭	১৪.০৩	১৫.৯০
সামগ্রিক বাজেট ব্যালেন্স	-৬.৭৭	-৬.৪৫	-৪.৯৪	-৪.৩৭	-৪.৮৫
বর্তমান অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স	-৩.২৬	-১.৮৫	-০.৩১	০.১৬	১.১০
সিপিআই (CPI) মূল্যস্ফীতি বার্ষিক শতাংশ	...	৭.৩৭	৫.৭৩	৬.০৪	৭.০৯

উৎস: BBS, *Statistical Yearbook*, various years.

৩.২.১। রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে অর্থনীতির পুনর্গঠন এবং পুনরুদ্ধার, ১৯৭২–১৯৮২

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ উত্তরাধিকারসূত্রে একটি অতি-নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি লাভ করে যা আমদানি নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক মুদ্রার রেশনিং, অতিমূল্যায়িত বিনিময় হার, ভর্তুকি মূল্যে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির পাশাপাশি সার্বজনীন কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদান এবং অন্যান্য সরকার নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক কাঠামো বৈশিষ্ট্যযুক্ত। অনুমিত হয়, এ সময়ে আধুনিক ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের স্থায়ী সম্পদের প্রায় ৩৪ শতাংশ পাবলিক এন্টারপ্রাইজের অন্তর্ভুক্ত ছিল (Sobhan & Ahmad, 1980)।

এ সময়ের পুনর্গঠন পর্বটি বেশ কিছু বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী স্বাভাবিক বছরের তুলনায় ১৯৭২-৭৩ সালে জিডিপি ১৪ শতাংশের বেশি হ্রাস পেয়েছিল। সদ্য স্বাধীন দেশটি অবশ্য সাহসিকতার সাথে চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি স্বল্প সময়ের মধ্যে মাথাপিছু জিডিপি এবং প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকগুলো যেমন মোট সঞ্চয় এবং জিডিপির শেয়ার হিসেবে বিনিয়োগ ইত্যাদিকে তাদের স্বাভাবিক স্তরে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ দৃঢ় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে অভ্যন্তরীণ অভিমুখীকরণ পরবর্তী সময়ে আংশিক উদারীকরণ ও বেসরকারিকরণ, রাজনৈতিক ক্ষমতার সহিংস পরিবর্তন, 'রাজনৈতিক বিবেচনায় ঋণ'-এর দ্রুত বিস্তার এবং অর্থনৈতিক সংকটের প্রাথমিক লক্ষণসহ বেশ কিছু সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নেতিবাচক ঘটনা দ্বারাও এই সময়টিকে চিহ্নিত করা যায়। উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (ডিএফআই) বিস্তার,

লক্ষ্যযুক্ত (targetted) কর্মসংস্থান কর্মসূচির উত্থান, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সবুজ বিপ্লবের ওপর নির্ভরতা এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার প্রদান ইত্যাদি বিষয়কেও এ সময়ের বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করা যায়। তবে এই সময়কালটি বৈদেশিক সহায়তার ওপর উচ্চ নির্ভরশীলতা এবং 'বৈদেশিক নির্ভরতার সংকট'-এর উত্থানের মাধ্যমে শেষ হয়েছিল (Sobhan, 1982, 1991)।

এ সময়ে অর্থনৈতিক অগ্রাধিকার নির্ধারণের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮) ও পরবর্তীতে একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-১৯৮০) ব্যবহার করা হয়েছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি বণ্টনমূলক ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক নীতিমালা গ্রহণ করে, যাতে সরকারি খাতের আধিপত্যে একটি বিনিয়োগ কৌশল অবলম্বন এবং ভূমি সংস্কার, সমবায়ের সম্প্রসারণ, কৃষি খাতে ক্ষুদ্র কৃষক এবং ভূমিহীন শ্রমিকদের সহায়তা এবং সরকারি সেক্টরে শিল্পখাত নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয় এবং ব্যক্তিগত খাতের জন্য শুধুমাত্র ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাত ছেড়ে দেওয়ার কার্যক্রম গৃহীত হয়। যাইহোক প্রথম পরিকল্পনা চালু করার এক বছরের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ঘটনা যেমন ধারাবাহিক খরা (১৯৭২ এবং ১৯৭৩), বিধ্বংসী বন্যা (১৯৭৪) এবং এর পাশাপাশি বিশ্ববাজারে পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক আর্থিক সংকট এবং ১৯৭৪-১৯৭৫ সালের মন্দাসহ বিশ্বব্যাপী ঘটনাসমূহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিবেশে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করে এবং এর ফলস্বরূপ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রাসঙ্গিকতা অনেকটাই বিনষ্ট হয়ে পড়ে। তদুপরি ১৯৭৫ সালের অস্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিবর্তন পাবলিক সেক্টরের মাধ্যমে উন্নয়নের দর্শনে মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে।[৩]

ফলস্বরূপ ১৯৭৫-১৯৮২ সময়কালে বেসরকারি খাতের উন্নয়নের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়। ১৯৭৫ সালের পর নতুন শিল্প সক্ষমতা বিকাশ এবং অর্থনীতির পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকার অর্থনীতিতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের বৃহত্তর সুযোগ দিতে শুরু করে। এ সময়কালের এই নীতির ধারাবাহিকতা পরবর্তী সময়েও অব্যাহত থাকে। ব্যাংক, টেলিযোগাযোগ, মিডিয়া এবং পাট শিল্পসহ অনেক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগকে এ সময়ে বেসরকারিকরণ করা হয়েছিল। বেসরকারি উদ্যোগ ও বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন, সরকারি শিল্প বেসরকারিকরণ, সরকারি বাজেটে শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন এবং আমদানি ব্যবস্থা উদারীকরণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নানাবিধ ব্যবস্থাও গৃহীত হয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এ সময়কালে সংস্কার কর্মসূচি গভীর সংকটে নিমজ্জিত অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করতে অনেকটাই ব্যর্থ হয়। ফলে এ সময়কালে বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে, অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য আনতে, বিনিয়োগ ও দেশীয় সঞ্চয়কে উদ্দীপিত করতে এবং ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত টেকসই প্রবৃদ্ধির ভিত্তি প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়নি। এ সময়ের নীতি ও সংস্কারগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এ যে, এগুলোর বেশিরভাগই অর্থনীতির নির্দিষ্ট অথবা বহিরাগত ধাক্কার প্রতিক্রিয়া হিসেবে নেওয়া হয়েছিল এবং সবগুলোই স্বল্পমেয়াদি বৈশিষ্ট্যের ছিল।

লক্ষ করলে দেখা যায়, এ সময়ে দেশের অর্থনীতিতে যেসব স্বল্পমেয়াদি ধাক্কা যেমন: ১৯৭০- এর দশকে জ্বালানি তেলের মূল্যের তীব্র বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশের বাণিজ্যের শর্তে ব্যাপক অবনতি এ সকল কারণে ১৯৭৪-১৯৭৫ এর মধ্যে বাংলাদেশকে আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং বিনিময় হার সমন্বয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে বাধ্য করেছিল। এছাড়াও সামষ্টিক অর্থনৈতিক মৌলিক নির্দেশকগুলির অনুরূপ অবনতির কারণে আবারও বাংলাদেশকে ১৯৮০ সালে বর্ধিত তহবিল সুবিধা (EFF) এর আওতায় স্বল্পমেয়াদি

[৩] সেই সময়ের চিন্তাধারার বিকাশ এবং বিবর্তনের ব্যাখ্যার জন্য দেখুন Islam (1978)।

অর্থায়নের জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের কাছে সহায়তা নিতে বাধ্য করে। তবে ১৯৮০ সালে EFF-এর আওতায় যে সহায়তা তা ১৯৮১ সালের প্রথম দিকে স্থগিত করা হয়েছিল সম্মত ঋণের লক্ষমাত্রার মধ্যে অর্থনীতিকে সীমাবদ্ধ রাখতে বাংলাদেশের ব্যর্থতার কারণে।

৩.২.২। অর্থনীতির ধীর প্রবৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান ম্যাক্রো অস্থিরতা, ১৯৮৩-১৯৯০

এ সময়কালের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিস্তৃত বাৎসরিক ওঠানামাসহ ধীর প্রবৃদ্ধি (বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির গড় মাত্র ৩.৮৬ শতাংশ)।[৪] মন্থর প্রবৃদ্ধি ক্রমশই একটি টেকসই বৈশিষ্ট্য লাভ করে এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক সংকট সরকারকে স্থিতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্কার ব্যবস্থা বাস্তবায়নের দিকে পরিচালিত করে। এসব সংস্কারমূলক ব্যবস্থাগুলির বেশিরভাগই আর্থিক ভারসাম্য সংকট দ্বারা সৃষ্ট ছিল এবং আইএমএফ (IMF) এবং বিশ্বব্যাংকের কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত হয়েছিল।

১৯৮০-এর দশকের গোড়ার দিকে বেশিরভাগ নিম্ন আয়ের দেশে সামষ্টিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতাকে বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ (IMF) স্বল্পমেয়াদি বহির্মুখী ধাক্কার ফসল হিসেবে গণ্য না করে 'ত্রুটিপূর্ণ' নীতি বাস্তবায়নের ফলস্বরূপ দীর্ঘমেয়াদি কাঠামোগত ত্রুটির ফলাফল হিসেবে বিবেচনা করেছিল। যেমন, 'প্রেসক্রিপশন' ছিল যে উন্নয়নশীল দেশগুলির সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিগুলি তথাকথিত 'ওয়াশিংটন ঐকমত্যের' ভিত্তিতে মূল্য স্থিতিশীলতা এবং 'মূল্য সঠিককরণ' বিবেচনার দ্বারা চালিত হতে হবে। প্রতিকার হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানগুলি সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার একটি এজেণ্ডা প্রণয়ন করে যা ছিল বিভিন্নমুখী সংস্কারের একটি এজেণ্ডা যেমন ব্যাপকভাবে আমদানি উদারীকরণ, বিনিময় হার সমন্বয়, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণ, রাজস্ব সংস্কার, সরকারি ভর্তুকি প্রদান ব্যবস্থায় সংস্কার এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রগুলিকে বিস্তৃতকরণ। এসব সংস্কারের ফলে নিম্ন আয়ের দেশগুলি বহির্মুখী উন্নয়ন কৌশলের ওপর ভিত্তি করে টেকসই প্রবৃদ্ধির পথ অর্জন করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা হয়েছিল (Sobhan, 1992)।

১৯৮২ সালে বাংলাদেশ সংস্কারের উপর্যুক্ত প্যাটার্ন বাস্তবায়ন শুরু করে। ১৯৮৬-১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ 'স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটি' (SAF) এর অধীনে আইএমএফ এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করে এবং পুনরায় ১৯৯০-১৯৯৩ সময়কালে আইএমএফ এর 'এনহ্যান্সড স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটি' (ESAF) এর সহায়তা গ্রহণ করে (Rahman, 1991)। উভয় কর্মসূচিতে একটি 'নীতি কাঠামো পত্রের' (PFP) আওতায় এই সময়কালে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সামষ্টিক অর্থনৈতিক সংস্কারের এজেণ্ডা নির্ধারণ করা হয়েছিল। প্রোগ্রাম বা সেক্টর লোনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) দ্বারা প্রসারিত ধারাবাহিক কাঠামোগত সমন্বয় (SA) ঋণের মাধ্যমে 'ব্যাক আপ' প্রদান করতে এগিয়ে এসেছিল। এই ঋণগুলির মাধ্যমে সরকারকে বৈদেশিক মুদ্রা প্রদান করা হয় যা অর্থনীতির বিশেষ বিশেষ খাত বা এলাকায় নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের কাজে ব্যবহৃত হয়। এই ঋণের আওতাভুক্ত কিছু ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে বিশ্বব্যাংক থেকে শিল্প, জ্বালানি, আর্থিক ও কৃষি খাতের ঋণ এবং এডিবির খাদ্য শস্য খাতের ঋণ এবং শিল্প খাতের ঋণ। আইএমএফ তার পক্ষ থেকে সরকারকে বাজেট এবং লেনদেনদের ভারসাম্য, আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং প্রতিযোগিতামূলক বিনিময় হার সম্পর্কিত সামষ্টিক

---

[৪] ১৯৮০-এর দশকে বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির বার্ষিক হারের পরিবর্তনের সহগ ছিল ২৭ শতাংশের উচ্চ যা ১৯৯৭-২০০৭-এর মধ্যে ১২ শতাংশেরও নিচে নেমে আসে।

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার নীতির সাথে সম্পর্কিত ঋণ দেয়। বিশ্বব্যাংক এবং এডিবি-এর সেক্টরাল ঋণের মধ্যে ছিল কৃষি উপকরণ এবং পাবলিক ইউটিলিটি ও সেবার ভর্তুকি হ্রাসকরণ, আর্থিক নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ, আমদানি উদারীকরণ, রাজস্ব সংস্কার, পাবলিক এন্টারপ্রাইজগুলির বিভাজন, উন্নত রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থা এবং পাবলিক ইউটিলিটিগুলির ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন।

কাঠামোগত সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনৈতিক সংস্কারের ব্যাপারে উচ্চ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে সামঞ্জস্য কর্মসূচিগুলো খুব সামান্যই কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হয় (Rahman, 1991; Sobhan, 1993; Mujeri et al., 1993)। তথাপি, এ কথা বলা যায় যে, সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোগত সংস্কারগুলো আর্থিক খাতকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে, শিল্প ও মুদ্রাবাজারে বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে, আমদানি শুল্কের হার কমিয়ে এবং কৃষিতে ভর্তুকি সামঞ্জস্যপূর্ণ করে এবং বিভিন্ন উৎপাদনশীল খাত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পগুলোকে বেসরকারিকরণ করে এক সময়ের নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে একটি বাজারচালিত ব্যবস্থায় রূপান্তরের সূচনা করে। ১৯৯১ এবং ১৯৯৩ সালের মধ্যে আইএমএফ এর সাথে সম্পাদিত একটি বর্ধিত কাঠামোগত সমন্বয় সুবিধা (ESAF) কর্মসূচির অধীনে আরও বেশ কিছু অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন করা সম্ভব হয়। এ ধরনের কিছু ইতিবাচক ফলাফল অর্জন সত্ত্বেও এ কথা বলা যায় যে, দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অগ্রাধিকারের কোনো ব্যাপক মূল্যায়ন ব্যতিরেকে এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠীর ওপর এ ধরনের সংস্কার সৃষ্ট বোঝার অসম বণ্টনের ফলে এই সময়ে বাস্তবায়িত সমন্বয় কর্মসূচি কোনোরকম বাস্তবসম্মত নীতি কাঠামো প্রদান করতে সক্ষম হয়নি যা শক্তিশালী সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল (Sobhan, 1991; Mujeri et al., 1993)।

এইভাবে ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু করে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে বিভিন্ন উদারীকরণ নীতিকাঠামো চালু করে। এ প্রক্রিয়াটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে উদারীকরণের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল, যার মধ্যে ছিল অপ্রচলিত আইটেমগুলির রপ্তানিকারকদের রপ্তানি আয়ের একটা অংশ উচ্চ বিনিময় হারে গৌণ বাজারে রূপান্তর করার অনুমতি দেওয়া, শুল্ক স্তর হ্রাস করা এবং শুল্ক বিচ্ছুরণ, সরলীকরণ এবং যৌক্তিককরণ। শুল্ক কাঠামো এবং আমদানি প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার পাশাপাশি রপ্তানি প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছিল যেমন এক্সপোর্ট পারফরম্যান্স লাইসেন্সিং, এক্সপোর্ট পারফরম্যান্স বেনিফিট স্কিম, বিশেষ বন্ডেড ওয়্যারহাউস স্কিম, ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি সিস্টেম, এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম, এক্সপোর্ট প্রমোশন ফান্ড, ব্যাংক ঋণ এবং ট্যাক্স মওকুফ। ১৯৯০-এর দশকের প্রথমার্ধে শুরু হওয়া আর্থিক খাতের সংস্কারগুলির মধ্যে রয়েছে সুদ হারের উদারীকরণ, মুদ্রানীতির উন্নয়ন সাধন, অগ্রাধিকার খাতে ঋণ প্রদান, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধানকে শক্তিশালী করা, ব্যাংকগুলিকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা, ঋণ পুনরুদ্ধারের উন্নতি এবং পুঁজিবাজারের উন্নয়নকে প্রসারিত করা।

সেই সময়ের সংস্কারগুলো বাংলাদেশে উন্নয়নের ধারার বেশ কিছু গুণগত পার্থক্য সাধন করে। ১৯৮০-এর দশকের বেশিরভাগ সময় জুড়ে এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্তমান ছিল যেগুলো সে সময়ে অর্থনীতি ও সমাজের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর মধ্যে ছিল ধীরগতি এবং দ্রুত ওঠানামাকারী (fluctuating) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি; ক্রমবর্ধমান আর্থিক সংকটের সাথে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার অবনতি; শাসনের কর্তৃত্ববাদ, দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং 'ক্রনি ক্যাপিটালিজম'-এর উত্থান; ‘উপজেলা’ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে শক্তিশালী স্থানীয় শাসন গঠনের জন্য বিকেন্দ্রীকরণ প্রচেষ্টা; সুরক্ষা-

বেষ্টনী (safety net) কর্মসূচির ওপর গুরুত্ব প্রদান; এবং স্থানীয় উন্নয়ন, বিশেষ করে দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক উন্নয়ন উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ বাহক হিসেবে এনজিওদের উত্থান।

৩.২.৩। সংকটচালিত সংস্কার এবং অনুকূল প্রাথমিক অবস্থার সৃষ্টি, ১৯৯১-১৯৯৬

এ সময়কালটি অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের একটি ক্রান্তিকাল হিসেবে গণ্য করা যায়, বিশেষ করে উন্নত অর্থনৈতিক মৌলিক কাঠামো গঠন এবং মানব ও সামাজিক পুঁজির একটি 'থ্রেশহোল্ড' (threshold) স্তর অর্জনের ক্ষেত্রে। এ সময়টিকে যদিও প্রকৃতিতে একটি ক্রান্তিকাল হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে, তবুও একটি আরও উদারীকৃত এবং দায়িত্বশীল নীতি শাসন তৈরির সুবিধার্থে বিস্তৃত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার বাস্তবায়নের দিকে আরও সচেতন প্রচেষ্টা গ্রহণের সময় হিসেবেও এ সময়কে চিহ্নিত করা যায়।

এই সময়কালটি সরকারি খাতের জন্য নির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ, মানব পুঁজির বিকাশের ওপর গুরুত্ব প্রদান, বিশেষ করে দরিদ্রদের জন্য সেবা প্রদানকারী হিসেবে এনজিওগুলির উত্থানের সাথে বেসরকারি খাতে অর্পিত মূল উন্নয়নমূলক ভূমিকার সাথে সাথে উল্লেখযোগ্য বাহ্যিক অভিমুখীতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। সরকার-এনজিও অংশীদারিত্বের স্বীকৃতি এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের দিকে উত্তরণও এর বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। অনেক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি দ্রুত পরিবর্তনের সময় ছিল। এই সময়কালে অর্থনৈতিক সংস্কার এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বৃহত্তর ধারা পুষ্ট হয়েছে (Mujeri, 2004)। বিশেষ করে এই সময়ে বাহ্যিক খাতে সংস্কারের ফলে প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকগুলিতে ইতিবাচক প্রবণতা সহ আরও শক্তিশালী বহির্মুখী অর্থনীতির উত্থান ঘটে।[৫] জিডিপি প্রবৃদ্ধির হারও বাড়তে শুরু করে বিশেষ করে ১৯৯০- এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে এবং পরবর্তী বছরগুলিতে এটি একটি সাধারণভাবে দ্রুততর প্রবৃদ্ধির প্রবণতা অনুসরণ করে।

৩.২.৪। অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নয়ন, ১৯৯৭-২০০৮

উচ্চতর প্রবৃদ্ধির প্রয়োজনীয় শর্তাবলি অর্জনের সাথে সাথে এই সময়টি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নয়ন উভয় ক্ষেত্রেই অনেক উন্নত ফলাফল প্রদর্শন করেছে। এটি সম্ভব হয়েছে দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কার সাধনের মাধ্যমে যা পূর্বের প্রথম পর্যায়ের প্রজন্মের ধীরগতির অর্থনৈতিক সংস্কার পদ্ধতির থেকে কিছুটা ভিন্নতর ছিল। বিশেষ করে এই সময়ের উন্নত অর্থনৈতিক অর্জন বিগত তিন পর্যায়ে চলমান 'প্রাথমিক অবস্থা' থেকে বাজার নির্ভর এবং গণতান্ত্রিক নীতি শাসনের মাধ্যমে গৃহীত নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনগুলির মধ্যে মিথস্ক্রিয়াগুলির ফলাফল হিসেবে গণ্য করা যায়।

আরও বিচক্ষণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য নীতির পাশাপাশি এই সময়ের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় ছিল, যেমন অনুকূল সামষ্টিক অর্থনৈতিক মৌলিক বিষয়গুলো অর্জন; অর্থনৈতিক উদারীকরণ, বাহ্যিক অভিমুখীকরণ এবং বেসরকারি খাতের ওপর নির্ভরশীলতা; কৃষি এবং গ্রামীণ উন্নয়নের ওপর বিশেষ দৃষ্টি প্রদান; এবং ব্যাপকভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা অর্জন ইত্যাদি বিভিন্ন ইতিবাচক অর্জনের ওপর

---

[৫] বাণিজ্য (পণ্য রপ্তানি ও আমদানি) এবং জিডিপি অনুপাতের দ্বারা পরিমাপ করা উন্মুক্ততা অনুপাত ১৯৯০ এবং ১৯৯৬ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ থেকে ২৮ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে ১৯৮৫ এবং ১৯৯০ এর মধ্যে এই অনুপাত মাত্র এক শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল (Mujeri, 2002)।

ভিত্তি করে আরও বিচক্ষণ নীতি অনুসরণের মাধ্যমে এই সময়কালে বাংলাদেশ উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সফল হয়েছে যার সাথে আয় দারিদ্র্য এবং শিশু অপুষ্টি হ্রাস সহ সামাজিক সূচকগুলোতে দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়েছে।

১৯৯০ এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ধারাবাহিকভাবে সকল সরকারই মুক্তবাজার নীতি, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগের বেসরকারিকরণ, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং আর্থিক এবং অন্যান্য খাত সংস্কারের জন্য রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছিল। ২০০৩ সালে সরকার IMF-এর সাথে একটি তিন বছরের দারিদ্র্য হ্রাস এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের (PRGF) সমঝোতায় স্বাক্ষর করে যার মূল লক্ষ্য ছিল ২০০৬ সাল পর্যন্ত সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচিকে সমর্থন প্রদান। বাংলাদেশে মূলধন হিসাব (capital account) উদারীকরণ ১৯৯৭ সালে শুরু হয়েছিল যার মাধ্যমে মূলধন হিসাবের বিধিনিষেধ সহজতর করা সহ অর্থবাজার, ডেরিভেটিভস, ক্রেডিট অপারেশন, সরাসরি বিনিয়োগ, রিয়েল এস্টেট লেনদেন, ব্যক্তিগত মূলধন হস্তান্তর, বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য নির্দিষ্ট বিধানসমূহের সংস্কার সাধন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সময়কালে আর্থ-সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্বেগের বেশ কয়েকটি বিষয়েরও সূচনা লক্ষ করা যায় যা সামাজিক-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ বলে গণ্য হয়েছিল, যেমন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সহ সুশাসনের অবনতি, ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষের ফলে ২০০৭-০৮ সালে জরুরি অবস্থা ঘোষণা। ২০০৭ সালে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন এবং ২০০৭-০৮ সালের বৈশ্বিক আর্থিক সংকট সহ সন্ত্রাসবাদ এবং বিশ্ববাজারে তেল ও অন্যান্য পণ্য (বিশেষ করে খাদ্য পণ্য যা বাংলাদেশ প্রচুর পরিমাণে আমদানি করে) মূল্যের তীব্র বৃদ্ধিও এ সময়ে লক্ষণীয়। তবে বাংলাদেশ সফলভাবেই এই সংকটগুলি কাটিয়ে উঠা সহ প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে।

৩.২.৫। অর্থনীতির সুসংহতকরণ এবং প্রবৃদ্ধির ত্বরণ, ২০০৯-২০২১

এই সময়কালে তৃতীয় প্রজন্মের কাঠামোগত সংস্কারের একগুচ্ছ নীতিমালা বাস্তবায়ন করা শুরু হয় যার মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধির ধারা চলমান রাখা এবং রাজস্ব বিচক্ষণতা অর্জন করা। এই সময়ের সংস্কারগুলি রাজস্ব ও চলতি হিসেবের ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে এবং মুদ্রাস্ফীতির হার হ্রাসের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। বিভিন্ন উদারীকরণ ব্যবস্থা এবং সমন্বয় কর্মসূচিও (যেমন, বেসরকারিকরণ, খাতভিত্তিক ঋণ ভর্তুকি যৌক্তিকীকরণ ইত্যাদি) অনুসরণ করা হয়েছিল। এই কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়নের ধীরগতি এবং অনুক্রম কিছুটা উদ্বেগের বিষয় হলেও এই ব্যবস্থাগুলি আরও অন্যান্য সমন্বয় কর্মসূচির সহায়তায় ম্যাক্রো এবং সেক্টরাল নীতিগুলিকে শক্তিশালী করতে এবং একটা যুক্তিসংগত স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনৈতিক মৌলিক কাঠামোর সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। যেমন, এ সময়ে সামগ্রিক রাজস্ব ঘাটতি বেশিরভাগ সময়ই জিডিপির ৫ শতাংশের ব্যাপকভাবে স্বীকৃত মাপকাঠির নিচে ছিল। এছাড়া চলতি হিসাবও অধিকাংশ বছরই উদ্বৃত্ত ছিল। এর ফলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ঋণ প্রদানকারী সংস্থার (যেমন বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ) কঠোর শর্তাবলি অনুসরণের বাধ্যবাধকতা শিথিল করতে সক্ষম হয়। অনেকাংশে বাংলাদেশ ২০০০- এর দশকে সংস্কারের নিজস্ব পথ অনুসরণ করেছে বলেই মনে হয়, বিশেষ করে স্থিতিশীলতা এবং সমন্বয়ের ক্রম ও গতির ক্ষেত্রে। এ সময়ে তুলনামূলকভাবে

কম মূল্যস্ফীতির হার এবং গ্রহণযোগ্য ঋণ স্থায়িত্বের সাথে সাথে বাংলাদেশ শক্ত শর্তসাপেক্ষ ঋণের ওপর নির্ভরতা অনেকটা হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছিল।

এই সময়কালে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি কাঠামো সুরক্ষায় আরও বেশি বিচক্ষণতার পরিচয় দিতেও সক্ষম হয়; এবং কিছু স্বল্পস্থায়ী এবং ছোট ধাক্কা ছাড়া পুরো সময়কালে অর্থনীতি যুক্তিসংগত মাত্রার স্থিতিশীলতা অর্জন করে। বিশেষ করে বাংলাদেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য রাজস্ব নীতির অবিবেচক ব্যবহার থেকে বিরত ছিল এবং এই সময়ে ঋণ-জিডিপি অনুপাত ৩৫ শতাংশের নিচে এবং বহিঃস্থ ঋণের পরিমাণ মোট রপ্তানি আয়ের ৪.৫ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়। ২০০২-২০০৭ সালের বৈশ্বিক উত্থান, জ্বালানি ও পণ্যের হ্রাসমান মূল্য এবং রেমিট্যান্সের ক্রমবর্ধমান ধারা স্থিতিশীলতা এবং প্রবৃদ্ধি বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্রমবর্ধমান রেমিট্যান্স এবং রপ্তানি জাতীয় সঞ্চয় এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে; এবং চলতি হিসেবের ঘাটতি হ্রাস করে ও দেশের আমদানি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এই সময়কালে বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তনও দেখা গেছে যা দেশের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সম্পদের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। একই সাথে তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানির টেকসই উচ্চ প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে রপ্তানি আয়ও দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে, খাদ্য উৎপাদনের বৃদ্ধি খাদ্য আমদানি ব্যয় কমাতে সাহায্য করেছে এবং অভিবাসী শ্রমিকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত রেমিট্যান্স উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি খাতের ঋণ ২০১৮ সালে জিডিপির ৩৩.৪ শতাংশে অনুমিত হয় যা ২০২০ সালে ৩৪ শতাংশে স্থিতিশীল রয়েছে। উপরন্তু, ২০১৮ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৬ শতাংশ এবং ২০১৯ এবং ২০২০ উভয় বছরই এটি ৬.১ শতাংশে অনুমিত হয়েছে। বাজেট ঘাটতিও লক্ষ্যমাত্রা জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে স্থিতিশীল ছিল।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আলোচিত সময়ের পাঁচটি পর্যায়ে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। বিশেষ করে, পূর্ববর্তী পর্যায়ের অনুকূল অবস্থার ওপর ভিত্তি করে, ২০০৯ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় ও সুবিধাজনক সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে এবং উচ্চতর এবং আরও স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের রেকর্ড স্থাপন করেছে (সারণি ৮)। এটি দেখা যায় যে, দেশের প্রবৃদ্ধির হার ধারাবাহিকভাবে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখিয়েছে বিশেষ করে ২০০০ এর পরবর্তী সময়ে; এবং এটি শক্তিশালী সামষ্টিক অর্থনৈতিক মৌলিক কাঠামো এবং অনুকূল নীতিমালা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, যা সঠিক নীতি অনুসরণের সাথে সাথে বাংলাদেশ অর্থনীতির উচ্চ এবং টেকসই প্রবৃদ্ধির পর্যায়ের সূচনা নির্দেশ করেছে।

সারণি ৮: বিভিন্ন নীতিমালার অধীনে সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকের মান

	১৯৭২-১৯৮২		১৯৮৩-১৯৯০		১৯৯১-১৯৯৬		১৯৯৭-২০০৮		২০০৯-২০২০	
	১৯৭৫	১৯৮২	১৯৮৩	১৯৯০	১৯৯১	১৯৯৬	১৯৯৭	২০০৮	২০০৯	২০২০
বার্ষিক বৃদ্ধির হার, %										
জিডিপি	৩.৪	২.৪	৪.০	৫.৯	৩.৪	৪.৬	৫.৪	৬.০	৫.১	৮.১
কৃষি	-১.০	১.০	৩.৯	৯.৪	২.২	৩.১	৬.০	৪.৫	৩.৫	৩.৫
শিল্প	৪২.০	৩.৯	৪.১	৭.০	৪.৬	৭.০	৫.৮	৭.০	৬.৯	১৩.০
সেবা	১.১	৩.৪	৪.২	৩.৩	৩.৩	৪.০	৪.৫	৫.৮	৫.১	৬.৫
মাথাপিছু জিডিপি	০.৪	০.৫	১.৯	২.৮	১.২	২.৯	৩.৯	৪.৬	৩.৭	৬.৯
জিডিপির % হিসেবে										
মোট বিনিয়োগ	৭.৫	১৭.৮	১৭.০	১৭.১	১৬.৯	২০.০	২০.৭	২৬.২	২৬.২	৩১.৬
মোট জাতীয় সঞ্চয়	০.৬	১৭.৯	১৭.৩	১৭.৬	১৯.৭	২০.০	২০.৭	২৭.৯	২৮.৯	২৮.৪
মোট রাজস্ব	১.৭	৭.১	৭.০	৬.৫	৭.৬	৯.২	৯.৬	৯.৬	৯.৮	১৩.৪
মোট কর রাজস্ব	১.৪	৫.৬	৫.৮	৫.৫	৬.২	৭.৩	৭.৯	৭.৬	৭.৯	১২.১
মোট সরকারি ব্যয়	৬.২	১১.৮	১০.৪	১১.৬	১৩.৬	১৩.৯	১৩.৩	১৪.৯	১৩.৪	১৮.৩
সামগ্রিক বাজেট ব্যালেন্স (অনুদান ব্যতীত)	-৩.১	-১৬.৯	-১৯.১	-৭.৪	-৬.০	-৪.৭	-৩.৭	-৫.৩	-৩.৫	-৪.৯
রপ্তানি	২.৫	৫.২	৫.৭	৬.১	৫.৫	৯.৫	১০.৪	১৫.৪	১৫.২	৯.০
আমদানি	৮.৭	১৫.৯	১৫.১	১৩.৫	১১.২	১৭.১	১৬.৯	২১.৩	১৯.৮	১২.৫
বর্তমান অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স	৪.৯	-৫.৪	-১.৯	২.৭	-৩.৯	-২.৩	-১.৩	০.৭	২.৪	-১.৪
মুদ্রাস্ফীতি, %	৬৭.২	৭.৫	১৩.৯	৪.৮	৭.৮	৬.৭	৪.০	১২.৩	৭.৬	৫.৪

টীকা: ১৯৭২ সালের তথ্যের অপর্যাপ্ততার কারণে ১৯৭৫ সালের তথ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর পুনরুদ্ধারের কারণে ১৯৭৫ সালে শিল্পের উচ্চ বৃদ্ধি হার হয়েছে। একইভাবে আপেক্ষিক উচ্চ বৃদ্ধি হয়েছে (বিশেষ করে কৃষির) ১৯৮৮ ও ১৯৮৯ এর দুইটি বিধ্বংসী বন্যার পরের বছরে পুনরুদ্ধারের কারণে।

উৎস: বিবিএস, পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ, বিভিন্ন বছর।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসের ৫০ বছরের স্বল্প সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো দেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক নীতি ব্যবস্থার তুলনামূলকভাবে দ্রুত ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। এটি আরও দেখায়, তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে এই সময়ে নীতি বিকাশের প্রক্রিয়া প্রভাবান্বিত হয়েছিল যা উল্লেখযোগ্য বিরতি দ্বারাও চিহ্নিত হয়েছিল। প্রথমত, ১৯৭৫ সালে হিংসাত্মক রাজনৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে একটি বাজারভিত্তিক অর্থনীতিতে মৌলিক উন্নয়ন দর্শনের দ্রুত পরিবর্তন। দ্বিতীয়ত, বিশ্বায়নের একটি শক্তিশালী তরঙ্গ যা অভ্যন্তরীণমুখী আমদানি-প্রতিস্থাপন বৃদ্ধির কৌশলকে উন্মুক্ত বাজার দিয়ে প্রতিস্থাপিত করেছে-বাজার ভিত্তিক এবং রপ্তানি-নেতৃত্বাধীন বৃদ্ধি টেকসই প্রবৃদ্ধির কাঠামো হিসেবে। তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অব্যবস্থাপনা এবং পুনরাবৃত্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্রমাগত অর্থনৈতিক সংকটের উদ্ভব, যার জন্য জরুরি নীতিগত প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন হয়েছে যা প্রায়ই আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং দাতা সম্প্রদায় দ্বারা 'নির্দেশিত' নীতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করেছে।

তথাপি বাংলাদেশের সামগ্রিক নীতি কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য হলো স্বাধীনতার পর থেকে দেশের বিচ্ছিন্ন নীতি প্রবাহের মধ্যে নীতির ধারাবাহিকতার বেশ কয়েকটি ধারার টেকসই উপস্থিতি, যেমনটি উপরে আলোচিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, এনজিও এবং সুশীল সমাজ সংস্থার (সিএসও) সাথে অংশীদারিত্বে সামাজিক উন্নয়নের ওপর জোরালো শক্তি প্রয়োগ এবং নীতিমালায় তৃণমূলে সংহতি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিথস্ক্রিয়া এবং নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্বের স্বীকৃতি। নিঃসন্দেহে, উন্নয়নের এই দিকগুলি প্রথাগত উন্নয়ন তত্ত্বে এখন পর্যন্ত পর্যাপ্তভাবে স্বীকৃত হয়নি, তবে এই সম্ভাবনাগুলোকে বিগত ৫০ বছরে বাংলাদেশ নিজস্ব উন্নয়নে প্রাথমিক স্বীকৃতি দিয়ে গুরুত্বের সাথে ব্যবহার করেছে সামগ্রিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায়। ফলস্বরূপ বেশিরভাগ সময়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধীর গতি সত্ত্বেও তুলনামূলকভাবে কম সময়ে সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশের সূচনা করতে বাংলাদেশ সক্ষম হয়েছে মাথাপিছু আয় কম থাকা সত্ত্বেও। এছাড়াও এই সময়ে আর্থ-সামাজিক বাধ্যবাধকতা এবং 'সংকট ব্যবস্থাপনা'র জরুরি প্রয়োজনীয়তা প্রায়শই নির্দিষ্ট নীতি শাসনের বিবর্তনে এবং দেশে নীতি পরিবর্তনের গতিশীলতা গঠনে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

৩.২.৬। প্রবৃদ্ধির ওপর সংস্কারের প্রভাব

বাংলাদেশে নীতি শাসনের বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো: বাস্তবায়িত সংস্কারগুলো কি দেশের প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনার ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল? ঐতিহ্যগত প্রবৃদ্ধির তাত্ত্বিক কাঠামো ব্যবহার করে নীতি সংস্কারের নিম্নোক্ত প্রবৃদ্ধি প্রভাব অনুমান করা যেতে পারে।

একটি সরল প্রচলিত ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে এটি অনুমান করা যেতে পারে যে, একটি অর্থনীতির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির পথে অভিসারণের গতির সমীকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে। Mankiw, Romer and Weil (1992) দেখিয়েছেন, একটি অর্থনীতি প্রতি বছর তার স্থিতিশীল সামগ্রিক প্রবৃদ্ধির পথে (steady state growth path) ব্যবধানের প্রায় ρ শতাংশ অতিক্রম করে এবং ρ-এর মান এভাবে নির্ণয় করা যেতে পারে:

$$\rho = (1 - \alpha)(n + g + \phi) \qquad (1)$$

যেখানে α হলো সামগ্রিক উৎপাদন ফাংশনে মূলধনের অংশ, n হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, g হলো শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধির হার এবং ϕ হলো পুঁজির অবচয় হার।

যেহেতু বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য এই প্যারামিটারগুলির দৃঢ় অনুমান অবর্তমান, তাই কিছু যুক্তিসংগত মান আমরা ব্যবহার করতে পারি। অনুমান করি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (n) ১.৩ শতাংশ, শ্রমশক্তির দক্ষতা (g) বৃদ্ধির হার ১.২ শতাংশ এবং মূলধনের অবচয় হার (ϕ) ৪.২ শতাংশ।[৬]

মূলধনের সংজ্ঞার ওপর নির্ভর করে সামগ্রিক উৎপাদন ফাংশনে মূলধনের (α) অংশের বিভিন্ন মানের বিস্তৃত পরিমাপ থাকতে পারে। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা ০.৪৫ মান ব্যবহার করেছি, যা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য α এর গড় মান। এই প্যারামিটারগুলি ব্যবহার করে ρ-এর মান ০.০৩৬৯ পাওয়া যায়।

[৬] ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলাদেশের জন্য গণনা করা গড় মানের সাথে অনুমান করা মান মোটামুটি মিলে যায়। শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির হারও আনুষ্ঠানিক খাতে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির ইতিহাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সংস্কারের সাথে সম্পর্কিত করার জন্য আমরা সহজ প্রবৃদ্ধি তত্ত্ব ব্যবহার করে অনুমান করছি যে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে সংস্কার পদক্ষেপের অবদান হলো দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীল সামগ্রিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি। সরলীকরণ অনুমানের ভিত্তিতে এটা বলা যেতে পারে যে স্বল্পমেয়াদে বৃদ্ধির হার (þ) এর সমান পরিমাণে ত্বরান্বিত হবে যেখানে Δ হচ্ছে সংস্কারের কারণে অর্থনীতির স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির আনুপাতিক পরিবর্তন।

আমরা অনুমান করছি যে সংস্কারের প্রভাবগুলি অর্থনীতির স্থিতিশীল সামগ্রিক প্রবৃদ্ধির পথে এককালীন এবং শুধু একবারের জন্য ঊর্ধ্বমুখী স্থানান্তর হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ৩.৬৯ শতাংশের þ মানের জন্য এবং ১৯৯০ এর দশক থেকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ১.৫ শতাংশের গড় বার্ষিক ত্বরণের সাথে একত্রে দেখা যায় যে এই সমগ্র সময়ের নীতি সংস্কারগুলি বাংলাদেশের অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীল সামগ্রিক প্রবৃদ্ধির গতিকে বৃদ্ধি করেছে প্রায় ৪১ শতাংশ। এ থেকে অনুমিত হয় যে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বাস্তবায়িত অতীতের সংস্কারগুলি অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনায় শক্তিশালী পরিবর্তন এনেছে, যা সংস্কার-পরবর্তী দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির পথকে প্রাক-সংস্কারের তুলনায় ৪০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি করেছে।

৩.২.৭। অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন: বিরতি এবং টার্নিং পয়েন্ট

দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির ওপর একক ফোকাস স্পষ্টতই কাঠামোগত পরিবর্তন সম্পর্কিত স্বল্পকালীন এবং গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় সঠিকভাবে নির্দেশ করতে সক্ষম হয় না। নিঃসন্দেহে, কৃষি থেকে অকৃষি অর্থনীতিতে বাংলাদেশের কাঠামোগত রূপান্তর একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া, তবে শিল্প বা সেবা খাতের দিকে কতটা স্থানান্তর ঘটবে তা রূপান্তরকালীন সময়ে দেশীয় নীতি এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিবেশের ওপর অনেকটাই নির্ভর করে। এগুলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন, ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির হার এবং স্থায়িত্বের ওপর নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করে। এছাড়া আরও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রবৃদ্ধির সংমিশ্রণ এবং সংশ্লিষ্ট কাঠামোগত পরিবর্তন যা দেশের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের জীবিকা ও কল্যাণে সমতা, এবং টেকসই জীবিকার উন্নতির ওপর বিভিন্নমুখী প্রভাব ফেলে।

এটি স্বীকার করা প্রয়োজন যে বাংলাদেশের বিগত পাঁচ দশকের প্রবৃদ্ধি ধারার একটি সরলরৈখিক ব্যাখ্যা ভুল সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে। স্বাধীনতার পরবর্তীতে প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় জিডিপিতে দ্রুততর প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল (দেখুন, সারণি ৪)। এছাড়া স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের বিভিন্ন উপ-কালের (sub period) মধ্যে প্রবৃদ্ধির হারের পরিবর্তনগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পরিবর্তনগুলো দেখায় যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ইতিহাসে একটি বড় বিচ্ছিন্নতা (break) স্বাধীনতার পরপরই ঘটেছিল; কারণ স্বাধীনতার আগে বাংলাদেশের অর্থনীতি বার্ষিক প্রায় ৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা ১৯৭০ এর দশকের শুরু থেকে ৪ শতাংশের উপরে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। একটি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, যদিও বর্তমানে এই ধরনের পরিকল্পনার গুরুত্ব অনেকটাই অস্বীকৃত, এই টার্নিং পয়েন্টের ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা রেখেছে এই মর্মে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

প্রবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী বিচ্ছিন্নতা ১৯৯০ এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে ঘটেছিল, যখন জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৪.৫ থেকে ৫ শতাংশের কাছাকাছি ত্বরান্বিত হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে ১৯৯০ এর দশকের

গোড়ার দিকে অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তনকে একটি 'ব্রেক' (break) হিসেবে গণ্য করা সংগত হবে না যেহেতু সংস্কার-পরবর্তী ১৯৯০-এর দশকে প্রবৃদ্ধির হার ১৯৮০-এর দশকের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিল না। প্রকৃতপক্ষে প্রবৃদ্ধির হার ২০০০-এর পরেই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০০-এর পরের সময়কাল এমনকি ২০০৮-০৯ সময়কালে আর্থিক সঙ্কটের সময় ধীরগতির প্রবৃদ্ধি অর্জনের পরেও ২০১৮ সালে ৮ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধিতে পৌঁছানো উচ্চ প্রবৃদ্ধির একটি স্বতন্ত্র পর্যায় হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। কাঠামোগত পরিবর্তন, যা জিডিপিতে কৃষি, শিল্প এবং সেবা খাতের শেয়ারের পরিবর্তনে প্রতিফলিত, বিস্তৃতভাবে প্রবৃদ্ধির হারের পরিবর্তনের মতো একটি প্যাটার্ন অনুসরণ করেছে যার বিষয়বস্তু সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে, যেমনটি আমরা উপরে দেখেছি, কৃষির অনুপাত গত পাঁচ দশক ধরে ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছে যখন শিল্প এবং সেবা উভয় খাতই তাদের শেয়ার বৃদ্ধি করেছে, তবে ভিন্ন গতিতে এবং ভিন্ন সময়ে। তদনুসারে সামগ্রিক জিডিপির প্রবৃদ্ধি এবং গুরুত্বের ক্ষেত্রে তাদের আপেক্ষিক অবদান বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। কাঠামোগত পরিবর্তনের পর্যবেক্ষিত প্যাটার্নের ভিত্তিতে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে, যার প্রতিটিরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

পর্যায় ১: স্বাধীনতার সময় থেকে ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত: এই সময়কালে শিল্পের তুলনামূলকভাবে উচ্চ প্রবৃদ্ধির দ্বারা চিহ্নিত যার ফলে এই দশকগুলিতে অর্জিত প্রবৃদ্ধির হারে একটি মাঝারি ধরনের ত্বরন দেখা যায় এবং জিডিপিতে অকৃষি খাতের শেয়ারের একটি দৃশ্যমান বৃদ্ধির সাথে সাথে একটি উল্লেখযোগ্য কাঠামোগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, বিশেষ করে সেবা খাতের উৎপাদনে।

পর্যায় ২: ১৯৯০- এর দশকের মাঝামাঝি থেকে ২০০০-এর দশকের শুরুর দিক পর্যন্ত: এই সময়কালটি জিডিপির তুলনামূলকভাবে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির দ্বারা চিহ্নিত করা যায়, যখন শিল্প ও সেবা খাতগুলোর প্রবৃদ্ধির ত্বরণের সাথে সাথে কৃষি থেকে অকৃষিতে কাঠামোগত পরিবর্তনের উচ্চ গতি অর্জিত হয়েছিল।

পর্যায় ৩: ২০০০ এর দশকের শুরুর দিক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত : এই সময়কালে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হারে একটি তীক্ষ্ণ ত্বরণ দেখা যায়, যেখানে প্রধানত সেবা খাতের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। এসময়ে কাঠামোগত পরিবর্তনগুলিও দ্রুতগতি লাভ করে, জিডিপিতে কৃষির শেয়ারের একটি বড় পতন দৃশ্যমান হয়, শিল্পের শেয়ারের উচ্চ প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও সেবাখাতকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং প্রধান খাত হিসেবে গণ্য করা সম্ভব হচ্ছে।

এইভাবে ১৯৮০ এর দশক থেকে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রাথমিকভাবে সেবা খাতের নেতৃত্বেই অর্জিত হয়েছে। শিল্প খাতের শেয়ার অনেকটাই ধীরগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০১০ সালের পরেই তা কিছুটা দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়েছে। শিল্পের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং এবং নির্মাণ উপখাতের শেয়ার উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্মাণসহ শিল্পখাতের সামগ্রিক শেয়ার ১৯৭৫ সালে ১০ শতাংশের মতো ছিল, যা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রায় ৩০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির ত্বরণ ১৯৯০-এর দশকে শুরু হয় এবং পরবর্তী বছরগুলোতে তা অব্যাহত থাকে। ফলে সেবা খাতের শেয়ার এখন অকৃষি খাতের মোট মূল্য সংযোজনে ৬৬ শতাংশের বেশি এবং মোট জিডিপিতে এর শেয়ার ৫৬ শতাংশের বেশি। ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে মোট জিডিপিতে সেবার শেয়ার ছিল ৩৭ শতাংশের কিছু বেশি। এতে দেখা যায়, গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি যে প্রাথমিকভাবে সেবা খাত দ্বারা চালিত

এটা অনেকটাই সুপ্রতিষ্ঠিত। এ প্রসঙ্গে বেশ কিছু মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে: (ক) শিল্প-নেতৃত্বাধীন প্রবৃদ্ধি ত্বরণের প্রথাগত প্রবৃদ্ধির প্যাটার্নের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির প্যাটার্ন একটি ভিন্ন ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তনের দিকনির্দেশনা করে কিনা যা সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির দ্বারা পরিচালিত; (খ) উত্তরটি যদি ইতিবাচক হয়, তাহলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কেন এমন একটি প্যাটার্নের উদ্ভব হলো; এবং (গ) সেবা খাতের নেতৃত্বে অর্জিত প্রবৃদ্ধি কতটা টেকসই। এই প্রেক্ষাপটে কোন ধরনের সেবা উপখাতগুলো এই সেক্টরের প্রবৃদ্ধি এবং আধিপত্যে অবদান রেখেছে তা বিশ্লেষণ করার জন্য সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির গঠনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশের সেবা খাতের বিশ্লেষণে দেখা যায়, চারটি সেবা উপ-খাত, যথা, পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য; গোষ্ঠীগত, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত সেবা; পরিবহণ, স্টোরেজ এবং যোগাযোগ; এবং আর্থিক মধ্যস্থতা এই সময়ের সেবা খাতের প্রবৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে। ১৯৭০-এর দশকে জিডিপিতে এসব উপখাতের শেয়ার ছিল প্রায় ২২ শতাংশ এবং ২০১০-এর দশকের শেষের দিকে তা বেড়ে প্রায় ৩৯ শতাংশে উন্নীত হয়।

৩.৩। সেবা খাত-নেতৃত্বাধীন প্রবৃদ্ধির প্রভাব

উপরের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশে শিল্প ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির হার কৃষি খাতের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি হয়েছে, এবং শুরুর দশকগুলোতে সেবা খাতের তুলনায় শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি বেশি হয়েছে। পরবর্তী সময়ে সেবা খাত আগের বছরগুলোর তুলনায় তুলনামূলকভাবে দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সেবা খাতের উচ্চ প্রবৃদ্ধির পেছনে বেশ কিছু কারণ থাকতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে সেবাখাতে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে, প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে, এবং ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠানগুলো নন-কোর কার্যকলাপের একটা ব্যাপক অংশ আউটসোর্সিং করছে, যা সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশের সিস্টেম অফ ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টস (SNA) এ সেবাসমূহকে একটি 'অবশিষ্ট' (residual) শ্রেণি হিসেবে গণ্য করা হয় যার মধ্যে বেশ কয়েকটি খানাভিত্তিক সেবা এবং কুটির/মাইক্রো খাতের উৎপাদন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত। এ সত্ত্বেও বাংলাদেশে সেবা খাতের দ্রুততর প্রবৃদ্ধির ধারাকে অস্বীকার করা যায় না।

ফলস্বরূপ সেবা খাত বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির একটি প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সেবা খাত থেকে উৎপন্ন হচ্ছে। এটাও লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কাঠামোগত রূপান্তরের এই ধরনটি বর্তমানে উন্নত পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশিরভাগ অর্থনীতির ক্ষেত্রে অনুসৃত ঐতিহ্যগত ধরন থেকে কিছুটা বিচ্যুত বলে গণ্য করা যায়। এই অর্থনীতিগুলি প্রাথমিক সময়ে কৃষি থেকে শিল্প খাতে সমৃদ্ধ হয়েছে; এবং তাদের উন্নয়নের একটি অগ্রসর পর্যায়ে সেবা খাতের অনুকূলে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল।

উপরোক্ত কাঠামোগত পরিবর্তনের ব্যাখ্যাটি কৃষি পণ্যের চাহিদার তুলনামূলকভাবে কম আয় স্থিতিস্থাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সাধারণভাবে আয়ের ক্রমবর্ধমান স্তরের সাথে কৃষি পণ্যের চাহিদা তুলনামূলকভাবে হ্রাস পায় এবং অকৃষি পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং আয়ের একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছানোর পরে বিভিন্ন খাতে সেবার চাহিদাও সামগ্রিক চাহিদার পরিবর্তন দ্বারা নির্ধারিত হয়। সরবরাহের দিক থেকে কৃষি মূলত উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট ফ্যাক্টরের ওপর নির্ভরশীল (অর্থাৎ ভূমি) যার বৃদ্ধির সীমাবদ্ধতা বর্তমান। ফলে কৃষিতে দ্রুততার সাথে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন তত্ত্ব ক্রিয়াশীল হয় (law

of diminishing returns)। অন্যদিকে শিল্প, বিশেষত ম্যানুফ্যাকচারিং, মূলধন ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিশাল সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম যা প্রযুক্তির মাধ্যমে অনেকটাই সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। একই যুক্তি সেবা খাতেও প্রযোজ্য কারণ বর্তমানে সেবাখাতের বিভিন্ন কার্যাবলিতে প্রযুক্তির প্রয়োগ উৎপাদন বৃদ্ধির পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করেছে। দেখা গেছে, সময়ের সাথে সাথে কৃষি খাতের শেয়ার ক্রমাগত কমেছে, অন্যদিকে শিল্প ও সেবা খাতের শেয়ার বেড়েছে। অর্থনীতির উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে আগামীতে উপরোক্ত ধারা আরও দ্রুততর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি প্রাথমিকভাবে সফটওয়্যার উন্নয়ন এবং তথ্য সেবার মতো ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততাকে উৎসাহিত করার কারণে শুরু হয়েছে; এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং সেবাখাতে কম স্থায়ী মূলধনের প্রয়োজনীয়তা এর গতিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

কাঠামোগত বিবর্তনের এই ধারা ক্রমবর্ধমান শ্রমশক্তিকে যদিও কৃষি থেকে শিল্প খাতে স্থানান্তর করতে সক্ষম হয়েছে, তবে বাংলাদেশে এই ধরনের শিল্পখাতে শ্রম স্থানান্তর খুব একটা বেশি সম্ভবপর হয়নি কারণ শিল্প খাত ক্রমবর্ধমান শ্রমশক্তিকে আত্মীকৃত করার মতো দ্রুত প্রসার লাভ করেনি। ফলস্বরূপ অদক্ষ গ্রামীণ শ্রমশক্তির একটা বড় অংশ শ্রমনিবিড় কৃষিখাতে এখনও স্বল্প মজুরিতে কর্মরত এবং গ্রামীণ শ্রমশক্তির যে অংশ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য কারণে কৃষিখাত থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে অথবা শহুরে এলাকায় অভিবাসন করেছে উন্নত কর্মসংস্থানের আশায়, তারা অনানুষ্ঠানিক বা বস্তি (slum) খাতে কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছে। এজন্য বাংলাদেশে জিডিপিতে সেবা খাতের অনুপাতের দ্রুত প্রবৃদ্ধি উন্নত দেশগুলির তুলনায় মাথাপিছু আয়ের অনেক কম স্তরে ঘটেছে, বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোতে যখন একই ধরনের রূপান্তরের সম্মুখীন হয়েছিল। প্রবৃদ্ধির এই ধারাটি ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও বেকারত্ব এবং দেশে উৎপাদন ও নির্মাণ কর্মকাণ্ডের অপর্যাপ্ত প্রবৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশে কৃষি ও শিল্প খাতের তুলনায় সেবা (নন-কমোডিটি) খাত অনেক দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর অর্থ হলো সঞ্চালনের প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন আয় সরাসরি উৎপাদনশীল প্রক্রিয়ার তুলনায় দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে; ফলে সেবা খাতের শেয়ারও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ধরনের পরিবর্তনের ধারার পেছনে অনেকগুলো কারণ বিদ্যমান থাকতে পারে।

সেবা খাতের একটি বড় অংশ হচ্ছে অবকাঠামোগত এবং প্রয়োজনীয় সেবা যেমন ব্যাংকিং, বিমা, অর্থ, পরিবহণ ও যোগাযোগ এবং সামাজিক ও গোষ্ঠীগত সেবা যেমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। বাংলাদেশে অর্থনীতির অন্যান্য খাতের চাহিদা পূরণ করতে এবং জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে এই সেবাগুলির দ্রুত সম্প্রসারণ একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। এছাড়াও বাংলাদেশে বিভিন্ন মৌলিক জনসেবা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সরকারি খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে গত কয়েক দশক যাবৎ সরকারি নীতিগুলি প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো বিস্তারের দিকে ক্রমবর্ধমানভাবে পরিচালিত হয়েছে। দ্রুত বিশ্বায়ন এবং ক্রমবর্ধমান গতিশীলতার ফলস্বরূপ প্রদর্শনী (demonstration) প্রভাবের ক্রিয়াকলাপও এই দ্রুত প্রবৃদ্ধির পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। দেশে ক্রমবর্ধমান নগরায়নকে অর্থনীতিতে সেবা খাতের দ্রুত সম্প্রসারণের আরেকটি কারণ হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে যোগাযোগ, পাবলিক ইউটিলিটি এবং বিতরণমূলক সেবাগুলির মতো অবকাঠামোমূলক সেবাগুলির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে নগরায়নও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ক্রমবর্ধমান নগরায়নের সাথে ব্যক্তিগত ব্যয়ের ধরনে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনও জড়িত রয়েছে।

বিশেষ করে এর ফলে অনেক নতুন নতুন পণ্য ও সেবা ভোগের ঝুড়িতে (consumption basket) প্রবেশ করতে সক্ষম হয় যার অনেকগুলোই সেবাখাতে উৎপাদিত।

সেবা খাতে আরেকটি উদীয়মান বৃদ্ধির চালক হলো পর্যটন যা আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) যেমন টেলিভিশন, ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্রমাগত প্রচারিত হচ্ছে। ইকোট্যুরিজমসহ পর্যটন অনেক ধরনের সেবার চাহিদা বৃদ্ধি করে। একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক কারণ হলো আইটি এবং জ্ঞান অর্থনীতির (knowledge economy) আবির্ভাব যা সেবা খাতে উচ্চ উৎপাদনশীলতা অর্জনের পথ সুগম করেছে। আধুনিক শিল্প কাঠামোর ক্রমবর্ধমান জটিলতা ম্যানুফ্যাকচারিং খাতকে আরও বেশি সেবামুখী করে তুলেছে। অ্যাকাউন্টিং, ফাইন্যান্স, আইনি সেবা, বিজ্ঞাপন, বিপণন এবং জনসম্পর্কের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের প্রতিফলন এবং এই সেবাগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে সেবাখাতের প্রতিষ্ঠানগুলোতে আউটসোর্স করা হয়, ফলে এই সেবা কার্যক্রমগুলি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও দেশের জিডিপিতে সেবা খাতের অবদান বৃদ্ধির জন্য পণ্য উৎপাদনকারী খাতগুলির সন্তোষজনক ও দ্রুততর প্রবৃদ্ধি অর্জনের ব্যর্থতাকেও বেশ কিছুটা দায়ী করা যেতে পারে। যদিও কৃষি খাতে দ্রুত প্রবৃদ্ধি আনতে অনেক সহজাত অসুবিধা রয়েছে, কিন্তু এটা বলা যেতে পারে যে, বাংলাদেশের শিল্প খাত এবং এর প্রধান উপাদান ম্যানুফ্যাকচারিং উপখাত পণ্য উৎপাদনকারী খাতকে দেশের জিডিপিতে একটি সন্তোষজনক শেয়ার দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রুত হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।

আগামী দশকগুলিতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়ে সৃষ্ট বেশ কিছু কারণই বাংলাদেশে সেবা খাতের দ্রুত প্রবৃদ্ধির জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। প্রকৃত মাথাপিছু জিডিপি বৃদ্ধির সাথে সাথে সেবা খাতের চাহিদা আনুপাতিক হারের চেয়েও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এর ফলে জিডিপি প্রবৃদ্ধিও দ্রুততর হবে। সেবা খাতের মধ্যে উৎপাদন সহায়ক এবং সরকারি সেবাগুলির চাহিদা, যা প্রধানত মধ্যবর্তী ভোগ (intermediate consumption) হিসেবে গণ্য করা যায়, চাহিদা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাবে, এবং সব সেবার জিডিপিতে প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিশালী গুণক বর্তমান। যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির নিবিড় ব্যবহারকারী এই ধরনের গতিশীল সেবা কার্যক্রমের বৃদ্ধি বিশেষ করে শিক্ষিত যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থানের ক্রমবর্ধমান সুযোগ সৃষ্টি করবে। এছাড়াও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বর্তমান প্রক্রিয়া বিজ্ঞাপন, প্রচার, বিপণন ইত্যাদির মতো নতুন নতুন সেবার উদ্ভব ও সম্প্রসারণের দিকে পরিচালিত করবে। এই উপখাতগুলি অর্থনীতির অন্যান্য সেক্টরগুলিতে প্রয়োজনীয় ইনপুট প্রদান করে, যার ফলে এসব উপখাতের সাথে একটা দৃঢ় সংযোগ গড়ে ওঠে। অধিকন্তু প্রয়োজনীয় সেবাগুলির দক্ষ সরবরাহ সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে শ্রম ও মূলধন উভয়ের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সেবা খাত শুধুমাত্র প্রবৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে এমনটা নয়, বরং এর ভূমিকা আরও বিস্তৃত হবে যা অন্যান্য সেবাগুলির জন্য ইতিবাচক বাহ্যিকতা (externality) সহ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করতে সক্ষম হবে। এছাড়া বাংলাদেশ সেবা খাতের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করতে সাম্প্রতিক বেশ কিছু বৈশ্বিক উন্নয়নকে কাজে লাগাতে পারে।

বর্তমানে বৈশ্বিক সেবা অর্থনীতির সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অংশ হচ্ছে জ্ঞানভিত্তিক সেবা যেমন, পেশাদার এবং প্রযুক্তিগত সেবা। প্রযুক্তিগত ব্যাপ্তি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনামূলকভাবে উন্নত

কাঠামো, বিপুল যুব জনসংখ্যা এবং কম শ্রম ব্যয়ের কারণে এই ধরনের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বেশ কিছু তুলনামূলক সুবিধা রয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতি বিভিন্ন ধরনের তথ্য-নিবিড় সেবা কার্যক্রমের উৎপাদন ও ব্যবহারের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে। এই কার্যক্রম গবেষণা এবং উন্নয়ন; কম্পিউটিং; জ্ঞান ব্যবস্থাপনা; মান নিয়ন্ত্রণ; অ্যাকাউন্টিং ও কর্মী প্রশাসন; সচিবালয়, বিপণন, বিজ্ঞাপন এবং আইনি-সেবা – এ সকল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সঞ্চালিত হচ্ছে। অধিকন্তু অন্যান্য সেক্টরের তুলনায় পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে সেবার বিশ্বব্যাপী মূল্য বর্তমান সময়ে নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে যোগাযোগের খরচ এখন দূরত্বের ওপর নির্ভরশীল নয়। ফলে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের ভৌগোলিক দূরত্ব দক্ষতাভিত্তিক কার্যক্রমের ব্যয়-কাঠামোতে এখন আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে না। সুতরাং অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি বা পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সহায়ক উন্নতি (catch up) এখন আর উচ্চ মূল্য সংযোজিত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য তেমন কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না।

ধনী দেশগুলির ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে বিশ্বের মোট উৎপাদনের অংশীদারিত্বে সাম্প্রতিক সময়ে পতনের প্রবণতা শিল্পের কাঁচামাল এবং জ্বালানির জন্য তাদের চাহিদার আপেক্ষিক হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। এর অর্থ হচ্ছে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর কম এবং সেবা-নিবিড় পণ্য সরবরাহের দক্ষতার ওপর বেশি নির্ভর করবে। উদাহরণস্বরূপ, উন্নত বিশ্বে জনসংখ্যার বার্ধক্য (aging) বৃদ্ধির প্রবণতা বিভিন্ন সেবা পণ্যের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধির প্রতি ইঙ্গিত করে। ফলে বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধার উৎস অতীতের তুলনায় এখন অনেকটাই ভিন্নতর হতে পারে। বাংলাদেশের মতো বেশ কিছু উন্নয়নশীল দেশ রয়েছে যেগুলো উৎপাদন প্রযুক্তি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, পুঁজির চলাচল এবং দক্ষ মানবশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকার কারণে বিশ্বায়ন এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের এসব সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে ভালো অবস্থানে রয়েছে।

অধিকন্তু সেবা খাতের সম্প্রসারণ বাংলাদেশের জনসংখ্যা, কর্মসংস্থান এবং বাণিজ্য অর্থনীতির সম্ভাবনার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে। তবে সেবা খাতে বৃহত্তর প্রতিযোগিতা এবং দক্ষতা প্রবর্তনের জন্য নীতি উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাতে রপ্তানি (বিশেষত সফটওয়্যার) এবং উচ্চ দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধিতে এর টেকসই অবদান নিশ্চিত করা যায়। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং উদ্ভাবনের ফলে কৃষি ও শিল্প খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কারণে কর্মসংস্থানের একটা বড় অংশ সেবা খাতে স্থানান্তরিত হবারও সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে প্রকৃত ব্যয়ের একটা বড় অংশ পণ্য খাত থেকে মূল্য সংযোজিত সেবা খাতগুলোতে স্থানান্তরিত হতে পারে। বাংলাদেশের জন্য সেবা খাত একটি বিশাল কিন্তু তুলনামূলকভাবে অব্যবহৃত সম্ভাব্য করভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হতে পারে এবং সেবাখাতের প্রবৃদ্ধি দেশের দীর্ঘমেয়াদি রাজস্ব নীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখতে পারে। সেবা-নেতৃত্বাধীন প্রবৃদ্ধি আরও ব্যাপক এবং টেকসই করার জন্য বাংলাদেশের একটি সুসংগত ও সমন্বিত সেবা নীতি (কৃষি ও শিল্প নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ) গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়াও বাংলাদেশে সেবা খাতে সংস্কারগুলি এখন পর্যন্ত একটা সামগ্রিক কৌশলের অংশ হিসেবে বাস্তবায়িত হয়নি বরং এগুলো অনেকটাই অ্যাডহক (adhoc) ভিত্তিতে গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়েছে। ফলস্বরূপ এসব সংস্কারের গভীরতা অপ্রতুল এবং গতি মন্থর রয়ে গিয়েছে; তদুপরি সেক্টরব্যাপী অভিন্নতার অভাবও প্রকটভাবে বিদ্যমান। বিভিন্ন সেবার মধ্যে শক্তিশালী

আন্তঃসম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য পরিপূরক সেবাগুলি সংশ্লিষ্ট সংস্কারের দ্বারা সমর্থিত না হলে একটি নির্দিষ্ট সেবা খাতে সংস্কার কাঙ্খিত ফলাফল প্রদান করতে সক্ষম হয় না। এজন্য একটি সমন্বিত সেবা নীতির বাস্তবায়ন ক্রম সংজ্ঞায়িত করা উচিত এবং সেই সাথে বিভিন্ন সেবাতে একযোগে সংস্কারের গতিও নির্ধারণ করা উচিত। উদ্বৃত্ত শ্রম আছে এমন সব সেবা খাতে সামাজিক নীতির সাথে সমন্বয় করে পর্যায়ক্রমে উদারীকরণ নীতি অনুসরণ করা যেতে পারে যাতে বেকারত্ব এবং সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি না হয়। এ ধরনের সমন্বিত কার্যক্রম বাংলাদেশে সেবা-নেতৃত্বাধীন প্রবৃদ্ধির গতিশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বজায় রাখতে অনেকটাই সক্ষম হবে।

৩.৪। ভিশন ২০৪১ এবং বাংলাদেশের উচ্চ আয়ের দেশে উত্তরণ

'ভিশন ২০৪১' বাস্তবায়ন এবং কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ (UMIC) এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) বর্তমানে বাস্তবায়িত হচ্ছে (PC, 2020)।

এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, উচ্চ-মধ্যম আয় বা উচ্চ আয় এই শ্রেণিবিভাগগুলি শুধুমাত্র মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে করা হয়, তাই এই বিভাজনগুলো অত্যন্ত বিস্তৃত এবং একই স্তরে অনেক ভিন্নধর্মী দেশের অবস্থান বর্তমানে বিদ্যমান। তদুপরি এই ধরনের বিভাজন অনেকটাই কৃত্রিম, কারণ এই বিভাজনে এমন সব দেশ রয়েছে যারা উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া যেহেতু মধ্যম আয়ের দেশগুলির অগ্রগতি সরল রৈখিক নয়, তাই নিম্ন আয়ের থেকে মধ্যম আয়ে উত্তরণ অনেকক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকরও হতে পারে (Glennie, 2013)। উদাহরণস্বরূপ, মানব উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য ও অসমতার হ্রাসের সাথে এই বিভাজন সংশ্লিষ্ট নয়। তবে বাংলাদেশের মতো একটি দেশে একটি সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে নীতি এজেণ্ডা প্রণয়ন ও গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এধরনের শ্রেণিবিভাগ সহায়ক হয় যেমন এর ফলে কিছু উন্নয়ন সমস্যা যথা 'মধ্য আয়ের ফাঁদ' (middle income trap) এবং উচ্চ-আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনের ক্ষেত্রে উন্নয়ন চ্যালেঞ্জগুলি চিহ্নিত করা সহজতর হয়। প্রথমেই এ কথা বলা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশ ১৬ বছরের (২০১৫-২০৩১) মধ্যে নিম্নমধ্যম থেকে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশে ট্রানজিট করার জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। তবে এজন্য বাংলাদেশকে প্রবৃদ্ধির যে গতি অর্জন করতে হবে তা কিন্তু এখন পর্যন্ত নজিরবিহীন। প্রবৃদ্ধির ইতিহাস থেকে দেখা যায়, বর্তমান সময় অবধি একমাত্র চীন মাথাপিছু আয়ের ৭.৫ শতাংশ বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার অর্জন করে ১৭ বছরের মধ্যে নিম্নমধ্যম থেকে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে, যা এখন পর্যন্ত দ্রুততম (সারণি ৯)। সুতরাং বাংলাদেশকে চীনের চেয়েও দ্রুতগতিতে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে অগ্রসর হতে হবে। এর জন্য মাথাপিছু আয়ের কাঙ্খিত বৃদ্ধি ও উত্তরণ সুরক্ষিত করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

সারণি ৯: নিম্ন মধ্যম থেকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে ট্রানজিট করার জন্য কয়েকটি নির্বাচিত দেশের প্রয়োজনীয় সময়কাল (বছরে)

দেশ/অঞ্চল	নিম্ন MIC হওয়ার বছর	উচ্চ MIC হওয়ার বছর	স্থানান্তরের সময় (বছরে)	মাথাপিছু গড় আয় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি %
চীন	১৯৯২	২০০৯	১৭	৭.৫
মালয়েশিয়া	১৯৬৯	১৯৯৬	২৭	৫.১
দক্ষিণ কোরিয়া	১৯৬৯	১৯৮৮	১৯	৭.২
তাইওয়ান, চীন	১৯৬৭	১৯৮৬	১৯	৭.০
থাইল্যান্ড	১৯৭৬	২০০৪	২৮	৪.৭
বুলগেরিয়া	১৯৫৩	২০০৬	৫৩	২.৫
তুরস্ক	১৯৫৫	২০০৫	৫০	২.৬
কোস্টারিকা	১৯৫২	২০০৬	৫৪	২.৪
ওমান	১৯৬৮	২০০১	৩৩	২.৭

উৎস: Felipe et al. (2012).

একথা সত্য যে, বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে আরও বেশি অর্থনৈতিক ও আর্থিক উন্মুক্ততার (openness) ফলে সৃষ্ট বর্ধিত বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হবে। এজন্য যদি যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত না করে বাংলাদেশ তার অর্থনীতিকে ক্রমান্বয়ে পণ্য ও পুঁজির বৈশ্বিক প্রবাহের সাথে যুক্ত ও উন্মুক্ত করে, তাহলে দেশের অর্থনীতি বিশ্বব্যাপী সংকট দ্বারা আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পাবে। আর্থিক দুর্বলতার চ্যালেঞ্জ দেশের জন্য আরও গুরুতর হতে পারে যদি পুঁজিতে সহজ প্রবেশাধিকার লাভের জন্য বাংলাদেশ আর্থিক বাজারকে অতিরিক্ত উদারীকরণ করে। একথা স্বীকৃত যে, সীমিত সঞ্চয়ের বাংলাদেশ অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় উৎপাদনশীল বিনিয়োগের জন্য অর্থায়ন (বিশেষ করে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ) আকর্ষণ করার জন্য মূলধনের গতিশীলতা প্রয়োজন। এজন্য আগামী দিনের জটিল উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশকে তার আর্থিক খাতকে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে এবং বৈশ্বিক আর্থিক বাজারে একীভূতকরণ বৃদ্ধির জন্য সংস্কার ত্বরান্বিত করতে হবে, সেইসাথে আরও উন্মুক্ত ও উদার মূলধন অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর্থিক দুর্বলতা এড়ানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশের জন্য একটি শক্তিশালী ও সমন্বিত মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর বাস্তবায়নসহ সমন্বিত সংস্কার প্রয়োজন যাতে আর্থিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ঝুঁকি হ্রাস করা যায় (World Bank, 2010; Van Doorn et al., 2010)। এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বর্তমান সময়ে অর্থনীতিতে বিদ্যমান বিনিময় হারের অনমনীয়তা, উচ্চ ঋণ ইক্যুইটি অনুপাত, অর্থনৈতিক অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণের জন্য ভূ-আঞ্চলিক সহযোগিতার অভাব এবং স্থানীয় মুদ্রা বাজারকে গভীর করার জন্য দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (Gill & Kharas, 2007; UN General Assembly 2011; Foxley, 2009)।

এছাড়াও অস্থিতিশীলতা অতিরিক্ত অর্থনৈতিক একীকরণ থেকেও উদ্ভূত হতে পারে যা প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন। একথা সত্য যে, বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের

অর্থনীতির দ্রুত সংহতকরণ বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে যদি দেশীয় শিল্প পর্যাপ্ত প্রতিযোগিতামূলক না হয় এবং কৃষি থেকে শিল্প উৎপাদনে অপরিকল্পিত স্থানান্তর ঘটে। প্রথম ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্প বৈশ্বিক উৎপাদনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে অক্ষম হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে, যা অর্থনীতিকে অস্থির বৈশ্বিক পণ্য বাজারের সম্মুখীন করে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শিল্প উৎপাদনে শ্রমের ধীরগতি সম্পন্ন স্থানান্তর বেকারত্ব বৃদ্ধি করে এবং শ্রমের মজুরি হ্রাস পায় এবং তা সঠিকভাবে নির্ধারিত হয় না। অন্যদিকে বৈশ্বিক আর্থিক সংকট থেকে পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে বৃহৎ পুঁজি প্রবাহকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা এই প্রক্রিয়াকে সহজতর করে, যা সীমিত ক্ষমতার আর্থিক ও রাজস্ব নীতি গ্রহণের পূর্বেই প্রবৃদ্ধি পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টায় সহায়ক হয়। এছাড়া বিশেষ করে বৃহৎ বৈদেশিক অ্যাকাউন্ট উদ্বৃত্তের প্রেক্ষাপটে আর্থিক নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণ একটি দীর্ঘ ও ধীরগতিসম্পন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া দুর্বল অর্থনীতির মৌলিক নির্দেশকগুলো এবং সংকটের স্বতঃসিদ্ধ শিথিলকরণ ধারা থেকে উত্তরণের জন্য সুসমন্বিত আর্থিক ও রাজস্ব নীতির সহায়তা থাকাও বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে আর্থিক খাতের সংস্কার ভবিষ্যতের সংকট রোধ করার জন্য একটি আর্থিক নিরাপত্তা বেষ্টনী পুনর্গঠন এবং পুনর্গঠনের মাধ্যমে দ্রুত আর্থিক ব্যবস্থা স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়ায় মনোনিবেশ করতে পারে।

তবে বাংলাদেশকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, সকল ব্যাংক (এবং ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি) শক্তিশালী এবং তাদের কার্যাবলি সম্পাদন করতে সক্ষম হচ্ছে। এছাড়া আর্থিক বাজারের উদারীকরণের গতি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে এবং বৈশ্বিক আর্থিক প্রবাহের সাথে দেশীয় আর্থিক বাজারের আন্তঃসংযোগের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকির বিরুদ্ধে ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ক্রমবর্ধমান মূলধন প্রবাহের ফলে সৃষ্ট অতিরিক্ত তারল্য শোষণের জন্য প্রচলিত বাজারভিত্তিক সুদের হারের হাতিয়ার এবং বিধিবদ্ধ রিজার্ভ রক্ষিত করার মতো প্রশাসনিক ব্যবস্থাসহ একাধিক হাতিয়ার সমৃদ্ধ একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি কাঠামো বাস্তবায়ন (Anglingkusumo, 2013)।

৩.৪.১। উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি: মধ্য-আয়ের ফাঁদ (middle income trap) অতিক্রমে সফলতা

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দ্রুত প্রবৃদ্ধি ও সুষম প্রতিযোগিতা অর্জনের ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো উচ্চ উৎপাদনশীলতার পাশাপাশি বিস্তৃত শিল্পায়ন বাস্তবায়ন। বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমান সময়ে শিল্প উৎপাদনের দিকে রূপান্তরিত হচ্ছে একথা সত্য; তবে দেখা যাচ্ছে যে শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতার সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রবৃদ্ধি অর্জন ব্যতিরেকে বাংলাদেশ কৃষি খাতের শেয়ারে তীব্র পতনের সম্মুখীন হয়েছে। এ ধরনের পরিবর্তন মধ্যম আয়ের ফাঁদে (middle income trap) পড়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক (Ohno, 2011)। এ বিষয়টি ‘মধ্যম আয়ের ফাঁদ’ ছাড়াও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনার সাথেও সম্পর্কিত।[৭] এটি এমন একটি পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত যেখানে মধ্যম আয়ের দেশগুলি উচ্চ-

[৭] মধ্যম আয়ের ফাঁদ’ শব্দটি ‘দারিদ্র্যের ফাঁদ’ (বা ‘নিম্ন-আয়ের ফাঁদ’) ধারণাটিকে বিপরীত করে, যা উন্নয়ন অর্থনীতিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। বহু বছর ধরে উন্নয়ন অর্থনীতি ‘দারিদ্র্যের ফাঁদ’-এর প্রতি মনোযোগ দিয়েছে, অর্থাৎ ‘[ক] একটি পরিবার, সম্প্রদায় বা জাতির জন্য এমন ভারসাম্য যা একটি দুষ্টচক্র জড়িত যেখানে দারিদ্র্য এবং অনুন্নয়ন আরও দারিদ্র্য এবং অনুন্নয়নের দিকে পরিচালিত করে, প্রায়শই এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে’ (Todaro & Smith, 2012: 175)। World Bank and DRC (2012) অনুসারে, বিগত অর্ধ শতাব্দীতে অনেক দেশ দ্রুত মধ্যম আয়ের মর্যাদায় বিকশিত হয়েছে, কিন্তু খুব কমই উচ্চ-আয়ের অবস্থানে উত্তরণ করতে পেরেছে। ১৯৬০ সালে ১০১টি মধ্যম আয়ের অর্থনীতির মধ্যে শুধুমাত্র ১৩টি ২০০৮

আয়ের অর্থনীতিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে অগ্রসর হতে ব্যর্থ হয়, কারণ তারা তাদের প্রবৃদ্ধির মডেলকে উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানে আরও বিশেষীকরণ, উদ্ভাবনের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি এবং সক্ষমতার ওপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে নতুন পণ্য এবং উন্নত ও অধিক উৎপাদনশীল প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্জিত হয় না (Gill et al, 2007)। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB) উপর্যুক্ত মধ্যম আয়ের ফাঁদ শব্দটি ব্যবহার করে নিষ্ক্রিয় (stagnant) দেশ এবং এমন সব দেশ যেগুলো উন্নত দেশের স্তরে ট্রানজিট করতে সক্ষম হচ্ছে না তাদের জন্য; এর কারণ হিসেবে স্বল্প খরচে শ্রমসহ সম্পদচালিত প্রবৃদ্ধি থেকে একটি সময়োপযোগী প্রযুক্তি চালিত প্রবৃদ্ধি সমৃদ্ধ অর্থনীতিতে রূপান্তর করার ব্যর্থতাকে দায়ী করে (ADB, 2011)।

উন্নয়ন অর্থনীতিতে মধ্যম আয়ের ফাঁদ বা মন্দার বিষয়ে বেশ কিছু যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রথমটি হচ্ছে অর্থনীতি 'লুইস টার্নিং পয়েন্টে' পৌঁছানোর পরবর্তীতে ক্রমবর্ধমান শ্রম ব্যয় (Wang & Weaver, 2013)। দ্বিতীয়টি হলো 'ক্যাচ-আপ' প্রভাবের পরিসমাপ্তি। একটি অর্থনীতি মধ্যম আয়ের স্থিতিতে পৌঁছানোর পরে মূলধন সঞ্চয়ে প্রান্তিক রিটার্ন দ্রুততার সাথে হ্রাস পায় যার ফলে শ্রম উৎপাদনশীলতা আরও বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ওপর বেশি নির্ভর করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু শিল্পায়নের অগ্রগতির সাথে সাথে এসব অর্থনীতি প্রযুক্তিগত সীমানার (technology frontier) কাছাকাছি অবস্থান গ্রহণ করে এবং বেশিরভাগ 'নিম্নে ঝুলন্ত ফল' (low hanging fruit) ব্যবহৃত হয়ে যাবার কারণে স্বল্পসংখ্যক ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য অবস্থিত থাকে। যেহেতু স্বল্পমূল্যের শ্রম এবং সহজ প্রযুক্তি ব্যবহারই হচ্ছে প্রধান চালিকাশক্তি যা বাংলাদেশের মতো নিম্ন আয়ের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিকে চালিত করে, তাই এই চালকগুলো নিঃশেষ হওয়ার ফলে প্রবৃদ্ধির নতুন ইঞ্জিন বিশেষ করে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং সৃজনশীল ক্ষেত্র চিহ্নিত না হলে তা উল্লেখযোগ্য মন্দার কারণ হয়ে উঠে। এই পুরাতন অকার্যকর চালকগুলোর কারণে সৃষ্ট ক্ষতি আন্তর্জাতিক সংযোগের মাধ্যমে আরও বৃদ্ধি পায়, যা বর্তমান বিশ্বায়িত বিশ্বে বিরাজমান। কোনো বাণিজ্য বাধা বা ঘর্ষণ (friction) এর অবর্তমানেও 'বালাসা-স্যামুয়েলসন প্রভাব' (Balassa-Samuelson effect) এমনভাবে কাজ করে যাতে দ্রুত বর্ধনশীল দেশের প্রকৃত বিনিময় হার বৃদ্ধি পায়, যা ঘটে দ্রুত অভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতি বা নমিনাল বিনিময় হার বৃদ্ধির মাধ্যমে বা উভয়ের মাধ্যমে (Samuelson, 1994)। এটি রপ্তানি-নেতৃত্বাধীন প্রবৃদ্ধিকে ধীর গতিসম্পন্ন করে এবং মধ্যম আয়ের দেশগুলোর রপ্তানি প্রতিযোগিতা ক্ষমতা হ্রাস করে।

এছাড়াও সামাজিক এবং পরিবেশগত কিছু কারণ রয়েছে যেগুলো মধ্যম আয়ের দেশের মন্দায় অবদান রাখতে পারে। ইনভার্টেড-ইউ (Inverted U) কুজনেটস বক্ররেখা দেখায় যে শিল্পায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে এবং পরবর্তী পর্যায়ে উন্নতি হওয়ার আগে আয়ের বণ্টন আরও অসম হতে থাকে (Kuznets, 1955)। যদিও কুজনেটস রেখার অভিজ্ঞতামূলক প্রমাণ ঐতিহাসিকভাবে কিছুটা বিদ্যমান, তবে অর্থনীতিতে 'লুইস টার্নিং পয়েন্টে' পৌঁছানোর আগে এবং পরে আয় বণ্টনের পরিবর্তনের ওপর লুইস মডেলের প্রভাবের সাথে এই অনুমিত শর্তটি কার্যকর হতে পারে। তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে, শিল্পায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে

সালের মধ্যে নিজেদেরকে উচ্চ-আয়ের অবস্থায় উন্নীত করতে পেরেছিল। ১৯৯৫ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের গোষ্ঠীতে মাথাপিছু সম্পদের বৃদ্ধি ছিল মাত্র ১১ শতাংশ, উল্লেখযোগ্যভাবে উচ্চ-আয়ের OECD গোষ্ঠী (২৫ শতাংশ), নিম্ন-মধ্যম আয়ের গোষ্ঠী (৪৮ শতাংশ), এবং নিম্ন-আয়ের গোষ্ঠীর (১৭ শতাংশ) তুলনায় যা অনেকটাই ধীরগতি সম্পন্ন (World Bank, 2011: 32)।

ক্রমবর্ধমান সামাজিক বৈষম্য সামাজিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক মন্দার পথও প্রশস্ত করতে পারে।

পরিবেশগত কুজনেটস বক্ররেখা (environmental Kuznets curve) মাথাপিছু আয়ের স্তর এবং পরিবেশ দূষণের স্তরের মধ্যে একটি 'উল্টো-ইউ' (inverted U) সম্পর্ক উপস্থাপন করে। যদিও গ্রিন-হাউস গ্যাস (GHG) নির্গমনের মতো ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে, বেশিরভাগ পরিবেশ দূষণকারক, যেমন সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট ম্যাটার (suspended particulate matter), সালফার ডাই অক্সাইড (sulfer dioxide), পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদি ক্ষেত্র সাধারণভাবে বক্ররেখার অভিক্ষেপ অনুসরণ করে। বক্ররেখার পিছনে যুক্তি হচ্ছে শিল্পায়নের প্রারম্ভিক স্তরে দূষণ হ্রাসের সুযোগ ব্যয় সাশ্রয়ী হয় না। যখন আয় একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছায়, তখন সমাজ দূষণের বিষয়ে যত্নবান হওয়ার আর্থিক ক্ষমতা অর্জন করে এবং এটি হ্রাস করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। Weil (2013: 488) ব্যাখ্যা করেন যে, 'যখন দূষণরোধ করার জন্য দূষকগুলো দূর করা হয়, তখন জিডিপি-পরিমাপিত প্রবৃদ্ধি প্রায়শই ধীরগতি লাভ করে'। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও মধ্যম আয়ের মন্দার অনেক যুক্তিসংগত কারণ বাস্তবতার সাথে যুক্ত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, 'লুইস টার্নিং পয়েন্টের' (Lewis turning point) প্রভাব বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দ্রুত 'জনমিতিক ট্রানজিশন' (demographic transition) দ্বারা তীব্রতর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একটি দ্রুত বয়স্ক সমাজের (aging society) উদ্ভব দেশের সামাজিক নিরাপত্তার বোঝা বৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ভবিষ্যতের জন্য ভিন্নতর ইঙ্গিত প্রদান করতে পারে যদি যথাযথ কৌশল সঠিক সময়ে বাস্তবায়ন না করা হয়।

উপরন্তু বাংলাদেশের আয়বৈষম্য ক্রমাগত বাড়ছে, গিনি সহগ (Gini coefficient) ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিকের ০.৪০ থেকে ২০১৬ সালে ০.৪৮ এর বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে মধ্যম আয়ের ফাঁদ অতিক্রম করার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য বেশ কয়েকটি নীতিগত বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, সরকারের আর্থিক সক্ষমতা অর্জন একটি সফল রূপান্তরের সূচনার মূল শর্ত। এক্ষেত্রে রাজস্ব সামর্থ্য হচ্ছে চূড়ান্ত নির্ধারক যা সরকারি পণ্যের গুণমান এবং স্তরকে প্রভাবিত করে যেগুলো ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি উচ্চতর ও টেকসই করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, দেশের আর্থিক বাজারের বাস্তব প্রবণতা ও সমস্যাগুলি অত্যন্ত প্রকট এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন আর্থিক সংস্থাগুলির বর্তমান আধিপত্য এই বাজারগুলিকে অনেকটাই বিকৃত করেছে ও এই বিকৃতিগুলি মধ্যম আয়ের ফাঁদে হোঁচট খাওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। এই বিকৃতিগুলি থেকে মুক্তির জন্য বাজারগুলির আরও আর্থিক স্বাধীনতা প্রয়োজন যাতে 'সৃজনশীল ধ্বংসের' (creative destruction) একটি শুম্পেটেরিয়ান (Schumpeterian) প্রক্রিয়া গতিশীল হতে পারে যা ব্যক্তিগত উদ্যোক্তার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরও বৃহত্তর ভূমিকা পালন করতে পারে।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশে নিম্নমধ্যম আয় থেকে উচ্চ-মধ্যম আয়ের অবস্থানে উত্তরণকালে ব্যাপক নগরায়নের পটভূমিতে শহুরে আবাসনের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি। এই হাউজিং মার্কেটের বিস্ফোরণ কীভাবে পরিবারের সঞ্চয়কে প্রভাবিত করে তা জাতীয় সঞ্চয়, ঋণযোগ্য তহবিল বাজার এবং এই পরিবর্তনগুলো অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির প্রবণতার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা বিদ্যমান। উচ্চ-মধ্যম আয়ের পর্যায়ে প্রবেশ করার সময় বাংলাদেশের যে শিল্পোন্নয়নের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে তা হতে হবে এমন যা অর্থনীতিকে শ্রমঘন থেকে প্রযুক্তি–নিবিড় উৎপাদন

প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত করবে এবং একইসাথে মজুরি বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিযোগিতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে (World Bank, 2012)।

উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিগত দক্ষতা সঠিকভাবে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বর্তমানে দুটি প্রধান প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন। প্রথমটি হচ্ছে শিল্প উৎপাদনের প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করা হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের বিকাশের মাধ্যমে যা সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে খুব একটা সহায়ক হয় না (Cervantes-Godoy & Brooks, 2011)। এজন্য শুধুমাত্র এই ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলি প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট নয় (Ohno, 2009)। এই বিষয়টি সঠিকভাবে সমাধান করা না হলে বাংলাদেশ উৎপাদনশীলতা-হ্রাসকারী কাঠামোগত রূপান্তরের সম্মুখীন হতে পারে, যেখানে শ্রম কম উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে বেশি ব্যবহৃত হবে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে একটি নতুন শিল্পায়িত মধ্যম আয়ের বাংলাদেশকে চীন ও ভারতের মতো আঞ্চলিক শক্তির সাথে প্রতিযোগিতা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, চীন এবং ভারত উভয়ই সস্তা শ্রম-নিবিড় শিল্পের একটি বড় অংশ ব্যবহার করে এবং এসব দেশের স্বল্প মজুরি এবং বৃহৎ স্কেল অন্য আঞ্চলিক দেশগুলোর বাজার প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে (Chandra et al., 2012), যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই আঞ্চলিক 'পাওয়ার হাউসগুলি' বাংলাদেশের মতো তুলনামূলক ছোট দেশগুলোর উর্ধ্বমুখী অভিযাত্রায় সহায়তা প্রদান করতে পারে।

বাংলাদেশ একটি নব্য মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে প্রাথমিকভাবে শিল্প খাতে ফ্যাক্টর পুঞ্জিকরণ (accumulation) থেকে উপকৃত হতে পারে, যা ১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশকে দক্ষিণ কোরিয়া, নাইজেরিয়া ও মিশরের মতো দেশ প্রবৃদ্ধি অর্জনে ব্যবহার করেছিল। তবে যাই হোক না কেন মোট ফ্যাক্টর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ছাড়া শিল্পের বৃদ্ধি টেকসই করা সম্ভব নয় (Satoru, 1997)। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ কোরিয়ার নীতি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রতি প্রগাঢ় মনোযোগ এই দেশটিকে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে সক্ষম করেছে।[৮] দক্ষিণ কোরিয়ার উৎপাদনশীলতা-নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং নীতি ফোকাস বাংলাদেশের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে যা দ্রুত শিল্প উৎপাদন এবং ক্রমবর্ধমান মজুরি প্রদান করতে সক্ষম হবে। বাংলাদেশের জন্য প্রতিযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হলো শিল্পনীতির জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। অতীতে শিল্পায়নের নিম্ন স্তরে বাণিজ্য উদারীকরণ এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে (Altenburg, 2011)। এসময়ে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর গুরুত্বের ততটা প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। বাংলাদেশের শিল্পায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে এজন্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে সঠিকভাবে কার্য সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতিতেও।

অন্তত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশের জন্য শিল্পনীতির জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ: (ক) লাভজনক ও সম্ভাব্য প্রধান খাতগুলো কী তা নির্ধারণ করা এবং বিভিন্ন সেক্টরের উৎপাদনে সামঞ্জস্য বিধান করা, (খ) মাধ্যমিক খাতের উৎপাদন সম্প্রসারণ এবং স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে নীতিগত সমন্বয়ের অভাব দূর করা সহ অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধি সঠিকখাতে পরিচালনা করা, এবং (গ) অবকাঠামো, আইন এবং গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে পাবলিক ইনপুটগুলির

---

[৮] দক্ষিণ কোরিয়া ১৯৫০ এর দশকের শেষের দিকে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির একক লক্ষ্যে 'কোরিয়ান উৎপাদনশীলতা কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করে। এই প্রতিষ্ঠানটিকে অর্থনৈতিক নীতি পরিকল্পনায় একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করতে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল, যাতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির নীতি অন্তর্ভুক্ত করা যায় (KDI, 2011; Hak, 2005)।

দক্ষ ও ন্যায়সংগত বণ্টন নিশ্চিত করা (Altenburg, 2011)। মধ্যম আয়ের যে সমস্ত দেশ শিল্প নীতিতে দুর্দান্ত সফলতা অর্জন করেছে সে সমস্ত দেশ অর্থনৈতিক উদারীকরণের সাথে সাথে কার্যকর প্রতিষ্ঠানও প্রতিষ্ঠা করেছে (Cheng et al., 1998)। এর মাধ্যমে মধ্যম আয়ের দেশগুলির জন্য অর্থনৈতিক উদারীকরণের সাথে তাল মিলিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের যে গুরুত্ব তা প্রকাশ পায় (Altenburg, 2011)।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনে রাষ্ট্রের কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের ক্ষমতা ব্যবহার মধ্যম আয়ের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। মধ্যমআয়ের অর্থনীতিগুলি অনেক সময় সেক্টরের উৎপাদনশীলতায় নিম্ন ভারসাম্যের মধ্যে পতিত হয় এবং বিনিয়োগ ও উদ্যোগগুলিকে সঠিকভাবে একত্রিত করতে সক্ষম হয় না (Rodriguez-Clare, 2005)। এর প্রধান কারণ হচ্ছে মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে অনেক সময় ক্রমবর্ধমান দক্ষ শ্রমশক্তি বিদ্যমান থাকে, কিন্তু অপর্যাপ্ত মূলধনের কারণে এইসব দেশ সঠিকভাবে বিনিয়োগ করতে পারে না এবং ফলস্বরূপ আধুনিক সেক্টরের উৎপাদন থেকে লাভবান হতে সক্ষম হয় না । এইসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করার জন্য কেন্দ্রীয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়, বিশেষ করে বাজার ব্যবস্থার সমন্বয় সাধনের ব্যর্থতা দূর করতে (World Bank, 1993; Jomo, 2001; Rodrik, 2008)। তবে, উৎপাদনশীল খাতের বাজারের ব্যর্থতা সংশোধনের লক্ষ্যে গৃহীত নীতিগুলি অবশ্য খণ্ডিতভাবে (piece-meal) নেওয়া অথবা অস্বচ্ছ এবং ভালোভাবে সমন্বিত না হওয়া একান্তই অনুচিত। আরও গুরুত্বপূর্ণ যা তা হচ্ছে নীতিগুলোকে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জনের ওপর যথেষ্ট ফোকাস সম্পন্ন হওয়া উচিত, যা উচ্চ মূল্য-সংযোজিত কর্মকাণ্ড সম্বলিত বিস্তৃত-ভিত্তিক কাঠামোগত পরিবর্তনে সহায়তা প্রদান করে এবং টেকসই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির চালিকাশক্তি হতে পারে। এটা দেখা যায়, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনের সফল রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা পুঁজি ও বিনিয়োগকে দক্ষতার সাথে সংগঠিত করতে সক্ষম হয় (World Bank, 1993)।

বাংলাদেশের উচ্চ-মধ্যম এবং উচ্চ-আয়ের দেশে রূপান্তরের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলোর একীভূত (integrate) করার ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে রপ্তানি শিল্পগুলোর ক্ষেত্রে উৎপাদনের স্কেল সুবিধা (economies of scale) অর্জন করা এবং প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন ধরনের শিল্পের বিকাশ সাধন করা। প্রথমত, উলম্ব ইন্টিগ্রেশন (vertical integration) অর্জন করতে হবে যাতে উৎপাদন খরচ সীমিত অর্জন করা এবং উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিতকরণে সরবরাহ চেইন (supply chain) এবং কাঁচামালের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সম্ভব হয় (Gill & Kharas, 2007)। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক পুঞ্জীকরণ (economies of aggregation) থেকে সুবিধা প্রাপ্তির জন্য স্থানিক একীকরণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে (World Bank, 2009)। সবশেষে, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং আঞ্চলিক পুঁজিবাজারে প্রবেশাধিকার থেকে সম্পূর্ণরূপে উপকৃত হওয়ার জন্য আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা অতিরিক্ত সুফল প্রদান করতে পারে (Fallonu et al., 2001; UN General Assembly, 2011)। অধিকন্তু বাংলাদেশের জন্য এই ধরনের সহযোগিতার একটি বড় সুবিধা হচ্ছে নির্দিষ্ট ধরনের মধ্যবর্তী (intermediate) পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে (এসএমই) আঞ্চলিক উৎপাদন নেটওয়ার্কে সংশ্লিষ্ট করার সুযোগ গ্রহণ, উৎপাদনে মূল্য সংযোজন উন্নতিকরণ এবং সেইসঙ্গে এসব সুবিধা বিকাশের জন্য বাণিজ্যের গতিশীল বিশেষীকরণ (dynamic comparative advantage) এবং 'বাণিজ্য বিভক্তকরণ'কে (trade fragmentation) সহজতর করা যাতে উপযুক্ত (niche) স্থানীয় সুবিধাগুলো উন্নয়ন করা সম্ভবপর হয় (Kimura & Obashi, 2011)।

বৈশ্বিক উৎপাদন শৃঙ্খলে (production chain) এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্যের জন্যও অভ্যন্তরীণ নীতির সুবিধা প্রয়োজন, যেমন স্থানিক একীকরণ (spatial integration)। এটি অর্জনের একটি উপায় হচ্ছে শিল্প পার্ক স্থাপন এবং এগুলোর সার্বিক উন্নয়ন সাধন। এজন্য পার্কগুলোর নির্মাণ, অবস্থান ও কার্যকারিতার দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে সরকারকেই নিতে হবে।[৯] এটি বিদেশি ও অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ প্রবাহ বেগবান করতে সাহায্য করবে এবং প্রযুক্তি স্থানান্তরকে সহজতর করবে। এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে যেসব শিল্প দ্রুত নগরায়নের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে অধিকতর সক্ষম সেগুলোর প্রয়োজন বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে।[১০] এইভাবে উচ্চ মধ্যম আয় উত্তরণে সহায়তাকারী নতুন শিল্প প্রবৃদ্ধি নীতির সাথে তাল মিলিয়ে সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঠিক একীকরণ একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে উদ্ভূত হবে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উত্তরণের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হচ্ছে উদ্ভাবন ক্ষমতার দ্রুত বৃদ্ধিসাধন। যদিও শ্রম দক্ষতা বা উৎপাদনের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে মজুরি বৃদ্ধি উৎপাদনশীলতায় ক্ষতিসাধন করে না, কিন্তু সীমিত উদ্ভাবন, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং প্রযুক্তি ব্যবহার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সুফল দ্রুত নিঃশেষ করে দিতে পারে। টেকসইভাবে উৎপাদনশীলতা এবং প্রতিযোগিতা বাড়াতে উদ্ভাবন ক্ষমতার বিকাশ (innovation) একান্ত প্রয়োজন (Gill & Kharas, 2007)। একটি সফল উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের জন্য তিনটি বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ: (ক) এন্টারপ্রাইজ এবং দেশ-নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে আরও উন্নত দেশগুলির প্রযুক্তিগত জ্ঞানকে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি উল্লেখযোগ্য অংশের ক্ষমতা অর্জন; (খ) শ্রম নিবিড়, স্বল্প প্রযুক্তি ব্যবহৃত পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া থেকে মাঝারি এবং উচ্চ-প্রযুক্তি সম্পন্ন পণ্যগুলি উৎপাদনের দিকে একক এবং ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলির (TNC) উৎপাদনে মনোনিবেশ স্থাপন; (গ) অনুমোদিত স্থানান্তর; এবং (ঘ) মৌলিক আধুনিক ও প্রযুক্তি সমৃদ্ধ উৎপাদন প্রক্রিয়া গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তাকারী সামাজিক সক্ষমতা সৃষ্টির জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রবর্তন এবং এগুলোতে ক্রমবর্ধমান/উচ্চ তালিকাভুক্তি (enrollment) নিশ্চিতকরণ (Paus, 2013)।

বাংলাদেশে অধিকতর উদ্ভাবন অর্জনে দুটি প্রধান বাধা রয়েছে। প্রথমটি হলো গবেষণা ও উন্নয়নে (R&D) অত্যন্ত সীমিত পরিমাণে ব্যয়। উচ্চতর উদ্ভাবন উচ্চ প্রবৃদ্ধির সাথে সম্পর্কযুক্ত (World Bank, 2011)। গবেষণা ও উন্নয়নে সীমিত সরকারি ব্যয় এবং বেসরকারি খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়ের অনুপস্থিতি উদ্ভাবনকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে (ADB, 2011)। দ্বিতীয়টি হচ্ছে বিদ্যমান প্রযুক্তি এবং মানব পুঁজিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার অভাব যার ফলে উচ্চতর উদ্ভাবনে অবদান রাখার সম্ভাবনা সীমিত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে রয়েছে উচ্চ প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন শিক্ষিত জনশক্তির অপ্রতুল প্রাপ্যতা, গবেষণা ও মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা প্রদানে সক্ষম প্রতিষ্ঠানের অভাব এবং এধরনের শিক্ষিত জনশক্তির চাকুরির নিশ্চয়তা প্রদানের অক্ষমতা এবং এক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সীমিত সহযোগিতা (Gill & Kharas, 2007)। উপরের প্রেক্ষাপটে মধ্যম আয়ের সময়কালে দক্ষিণ কোরিয়ার

---

[৯] উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ কোরিয়ার শিল্প পার্কগুলি ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে মধ্যম আয়ের স্থিতিতে প্রবেশের প্রায় ২০ বছর পূর্বে তৈরি হয়েছিল। ফলস্বরূপ দক্ষিণ কোরিয়া একটি মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার কারণে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জগুলির সাথে সহজে সামঞ্জস্য সাধন করতে সক্ষম হয়েছিল।

[১০] নগরায়ন সামঞ্জস্যের একটি উদাহরণ হতে পারে রাজধানী ঢাকার কাছে একটি শিল্প পার্ক গড়ে তোলা, বিশেষ করে শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে স্থানান্তরিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের কেন্দ্রীভূত হবার সুবিধা অর্জনের জন্য।

যে অভিজ্ঞতা সেগুলি বাংলাদেশের জন্য বেশ কিছু মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে। প্রথমটি হচ্ছে বিনিয়োগ এবং প্রত্যক্ষ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সহজতর অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থার কৌশলগত ব্যবহার। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রাথমিকভাবে বেসরকারি খাতে ঋণের ক্ষেত্রে ভর্তুকি এবং ট্যাক্স প্রণোদনা প্রদান করতে পারে, যা আধুনিক সেক্টরের উৎপাদন ও রপ্তানির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে সহায়তা করবে এবং এর ফলে এ ধরনের এন্টারপ্রাইজগুলিতে সরকারি বিনিয়োগের সুযোগও সৃষ্টি করা সম্ভবপর হবে (Rodrik, 1995)। বেসরকারি খাতের চাহিদা অনুযায়ী বিশেষায়িত শিক্ষা, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন উদ্যোগকেও রাষ্ট্র ভর্তুকি প্রদান করতে পারে (World Bank, 2006)। বর্তমানে বাংলাদেশ সঠিকভাবে উদ্ভাবন প্রক্রিয়াকে সংগঠিত করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এক্ষেত্রে কর্নেল ইউনিভার্সিটি এবং ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন (WIPO) প্রকাশিত বার্ষিক গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্স ২০২০ থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশ এখনও দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বনিম্ন ১১৬তম স্থানে রয়েছে। নিম্ন-মধ্যম আয়ের ২৯টি দেশ এবং মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান যথাক্রমে ২৪তম ও ১০ম। বাংলাদেশের গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় এই অঞ্চলে সর্বনিম্ন এবং সরকার কর্তৃক এর সিংহভাগ ব্যয়িত হয়। তদুপরি বাংলাদেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি দেশটির শিক্ষা নীতির সাথে একীভূত নয় এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং উদ্যোগের মধ্যে খুব সীমিত মিথস্ক্রিয়া আছে। বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা প্রাথমিক উদ্ভাবনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক লাভের প্রচুর সম্ভাবনা এবং গবেষণা ও উন্নয়নে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততার অভাবের কারণে আরোপিত বাধা উভয়ই তুলে ধরে।

উপরন্তু কিছু ক্রস-কাটিং সমস্যা বাংলাদেশকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করছে, যার কিছু সম্পূর্ণরূপে প্রবৃদ্ধি-সম্পর্কিত এবং অন্যগুলি একইসাথে সমতা-সম্পর্কিত সমস্যাকেও প্রভাবিত করে। জনসংখ্যাকে সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলি বিভিন্ন উপায়ে প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক সেবা প্রদান উভয়কেই প্রভাবিত করে। বাংলাদেশকে অবশ্যই তার তরুণ, বর্ধনশীল এবং ক্রমবর্ধমান শহুরে জনসংখ্যাকে সঠিকভাবে ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করতে হবে। একটি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি; ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠী যাতে আধুনিক প্রযুক্তি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং তাদের সক্ষমতা আউটপুটে রূপান্তর করতে সমর্থ হয় তা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশের নীতিগুলিকে আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এসব জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং শিক্ষা নীতির অভিযোজন উভয়ের দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে। আরেকটি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সেবা প্রদান এবং সেবা ব্যবহারে প্রকট লিঙ্গ বৈষম্য সহ সামাজিক বৈষম্য। বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়নও বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। জনসংখ্যাগত রূপান্তরের ভৌগোলিক দিকগুলি স্থানিক রূপান্তরের সাথে একত্রিত হওয়া নগরায়ন বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যাই হোক না কেন শহুরে জনসংখ্যার বৃদ্ধি যে দ্রুত প্রবৃদ্ধির সাথে সম্পর্কযুক্ত এমনটা নয়, বিশেষ করে যখন অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে শহরগুলিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী কেন্দ্রীভূত হয়। এক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে যা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম এবং উচ্চ-আয়ের অবস্থানে বাংলাদেশের তুলনামূলকভাবে মসৃণ রূপান্তর নিশ্চিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতির দাবি রাখে।

এ প্রসঙ্গে উপরোক্ত নীতি এজেন্ডা যে পরিষ্কার বার্তা দেয় তা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং এগুলি নিরসনে নীতিগুলির সঠিক ক্রম (sequencing) নির্ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহ্যগত ক্রম-নির্ধারণ হচ্ছে শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার প্রদান, ক্রমাগতভাবে সংকট (crisis) থেকে উদ্ধার এবং সংকট প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন, সমতা ও কল্যাণ সাধন এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত অবক্ষয় প্রশমনের প্রচেষ্টা। এছাড়াও বৈষম্য মোকাবেলার ক্ষেত্রে হাতিয়ার হচ্ছে মৌলিক

কাঠামোগত (radical) পুনর্বন্টন নীতি নয়, প্রধানত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রদানের মাধ্যমে। বাংলাদেশের জন্য মৌলিক চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এমন একটি মডেল উদ্ভাবন করা যা দেশের একাধিক মৌলিক লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা গুরুতর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি না করে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে উপরোক্ত সমস্যাগুলি মোকাবেলা করতে পারে। বাংলাদেশের জন্য বৈষম্য নিরসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হচ্ছে উচ্চ মানের মৌলিক পণ্য ও সেবাগুলিতে সর্বজনীন এবং সমতাভিত্তিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। এজন্য এগুলোকে একটি 'সামাজিক সুরক্ষা ফ্লোর'-এর অংশ হিসেবে দেখা যেতে পারে - যা আয় সুরক্ষা এবং সকলের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবাগুলির সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য অর্থাৎ প্রণীত সামাজিক নীতিগুলির একটি সমন্বিত সেট, যাতে দুর্বল জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে এবং সমগ্র জীবনচক্র ব্যাপী সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা সন্নিবেশিত হয়েছে।

বাংলাদেশে বৈষম্যের যে ব্যাপক বিস্তৃতি তা থেকে এটা পরিষ্কার যে, সামাজিক সুরক্ষার প্রচেষ্টাগুলি এককভাবে বাস্তবায়ন কাঙ্ক্ষিত সুফল দিতে অনেকটাই অক্ষম, বরং এগুলিকে বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি কাঠামোর অংশ হিসেবে গণ্য করার পাশাপাশি বাস্তবায়িত করতে হবে যা বৈষম্য হ্রাস ভিত্তিক। এক্ষেত্রে বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে স্বাস্থ্য, পেনশন, বেকারত্ব, শিশুর যত্ন এবং প্রাথমিক শিক্ষার সুবিধাগুলিতে প্রবেশাধিকার সার্বজনীন করা এবং সেগুলিকে পরিবার ভিত্তিক না করে ব্যক্তি পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা। এটি দারিদ্র্য হ্রাস, বৈষম্য প্রশমন, টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং মহিলাদের জন্য বৃহত্তর ক্ষমতায়ন এবং স্বশাসনকে উৎসাহিত করতে আরও অবদান রাখবে। এছাড়াও সেবা এবং সুযোগগুলিতে আরও সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন।

তদুপরি বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি নীতিমালায় তথাকথিত 'নতুন মধ্যবিত্ত' (new middle class)-এর আবির্ভাব বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। ১৯৯০–এর দশকের পর থেকে এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত জনসংখ্যা বাংলাদেশে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বর্তমানে এই সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ। তবে এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত জনগণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দটি বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে, কারণ এটি তাদের নতুনভাবে অর্জিত অর্থনৈতিক শক্তির ওপর একক গুরুত্ব প্রদান করে, কিন্তু এই গোষ্ঠী যে আর্থ-সামাজিক সংকট (crisis) এর ক্ষেত্রে চরম অরক্ষিত (vulnerable) তা কিন্তু আড়ালে রাখে। একইসঙ্গে সংকট মোকাবেলার ক্ষেত্রে এই গোষ্ঠীর চরম দুর্বলতাকে মুখোশ-এর অন্তরালে রাখে (Kingstone, 2013)।

৪। উপসংহার

এটা সত্য যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর এবং সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। বর্তমানে দেশের জন্য একটি প্রধান নীতিগত চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আগামী দশকগুলিতে 'পূর্ব এশিয়ান অলৌকিক' ('East Asian Miracle') উন্নয়ন ক্ষমতার পুনরাবৃত্তি করা এবং তা টেকসই করা। এছাড়াও দুষ্প্রাপ্য সম্পদের সর্বোত্তম এবং সর্বাধিক উৎপাদনশীল ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশকে আন্তঃখাত ভিত্তিক সিনার্জিগুলিকে (cross-sectoral synergies) বিবেচনায় নিতে হবে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত মাত্রাগুলির সঠিক মূল্যায়ন করে বিষয়ভিত্তিক নীতি কাঠামো বাস্তবায়নের ওপর জোর দিতে হবে। মধ্যমেয়াদের জন্য বাংলাদেশের চারটি প্রধান উদ্বেগ মোকাবেলার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মনে হয়। এগুলো হচ্ছে, প্রথমত, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল যাতে সমাজের সকল জনগোষ্ঠীর মাঝে

আরও বিস্তৃত ও ন্যায়সংগতভাবে প্রবাহিত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় নীতি এবং প্রতিষ্ঠান ডিজাইন করা। দ্বিতীয়ত, আরোপিত উন্নয়ন প্রচেষ্টাগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া যাতে বাংলাদেশ উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে আরও বেশি সুবিধা অর্জন করতে পারে। তৃতীয়ত, উন্নয়নের অসমতা (development gap) দূর করার জন্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উপকরণ নির্ভর প্রক্রিয়ার (factor intensive mode) পরিবর্তে প্রযুক্তিঘন (technological) উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব প্রদান। চতুর্থত, সামগ্রিকভাবে বিশেষ করে কৃষিতে নীতির সমন্বয়ের ওপর আরও বেশি গুরুত্ব প্রদান।

এটা জোর দিয়ে বলা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশ বর্তমানে প্রধানত কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে উত্তরণের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তাই শিল্পে বিনিয়োগ সবচেয়ে বেশি আন্তখাত সংযোগ সৃষ্টি করবে। এই প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন মাধ্যম হবে উন্নয়ন করিডোর এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলিকে (SEZs) ‘প্রবৃদ্ধির খুঁটি’ (growth pole) হিসেবে ব্যবহার করা যাতে অনেকগুলি খাতে যুগপৎ ও সমন্বিত বিনিয়োগ অর্জন করা সম্ভবপর হয়, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে অবকাঠামো, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আর্থিক বিনিয়োগ। প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনুভূত প্রতিবন্ধকতার ওপর নির্ভর করে বিষয়সমূহও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, এক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়নের চাবিকাঠি হচ্ছে শিল্পে তুলনামূলক সুবিধার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলি বিকাশের মাধ্যম অন্বেষণ ও বাস্তবায়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বাজার সংযোগ বৃদ্ধি এবং সকল আন্তঃসংযোগ বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করা এবং বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সুবিধাগুলির কৌশলগত ব্যবহার নিশ্চিত করা। যেহেতু বাংলাদেশে এখনও বিশাল অবকাঠামোর ঘাটতি রয়ে গেছে এবং দেশের আর্থিক এবং বাস্তবায়ন ক্ষমতা উভয়ই এক্ষেত্রে সীমিত, তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই সীমিত সম্পদগুলির কীভাবে সঠিক ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশকে বেশ কিছু বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে যেমন প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতিতে অবকাঠামো সেবাগুলি কীভাবে সর্বোত্তম সেবা প্রদান করতে পারে; এবং নির্দিষ্ট অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে বেসরকারি খাতসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সবচেয়ে কার্যকর ও দক্ষতার সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য সরকার কি ধরনের ব্যবস্থার (যেমন আর্থিক, নিয়ন্ত্রক এবং অংশগ্রহণমূলক) সহায়তা নিতে পারে।

একথা সত্য যে, বাংলাদেশকে ‘ভিশন ২০৪১’ বাস্তবায়ন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত করার যে স্বপ্ন তা অর্জনের জন্য বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে, তবে এটাও স্বীকার করতে হবে যে বাংলাদেশের সম্মুখে প্রচুর সুযোগ বিদ্যমান এবং এই সুযোগগুলিকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যথেষ্ট সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে আয়, অবকাঠামো, অন্তর্ভুক্তি এবং প্রতিষ্ঠান (income, infrastructure, inclusion, institution) এই চারটি 'I' এর মধ্যে উন্নত উন্নয়ন সমন্বয় সাধনের জন্য পারস্পরিক সহায়তার সাথে সক্ষমতা বৃদ্ধি, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা এবং নেটওয়ার্কিং এর ওপর দৃষ্টি প্রদান যা দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

ADB. (2011). Asia 2050: *Realizing the Asian century*. Singapore: Asian Development Bank.

Altenburg, T. (2011). *Industrial policy in developing countries: Overview and lessons from seven country cases.* Bonn: German Development Institute.

Anglingkusumo, R. (2013, May). Addressing the complexity of macroeconomic management in middle income countries. In: *Experts meeting on the common challenges of middle-income countries in Seoul* (pp. 13-15).

BBS. (2003). *Report of the Bangladesh labour force survey 1999-2000*. Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

BBS. (2017). *Report of the Bangladesh labour force survey 2016-2017*. Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

Besserman, L. (1996). *The Challenge of periodization: Old paradigms and new perspectives*. London: Routledge.

Cervantes-Godoy, D., & Brooks, J. (2011). *Smallholder adjustment in middle-income countries* (OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers No. 12). Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development.

Chandra, V., Lin, J. Y., & Wang, Y. (2012). *Leading dragon phenomenon: New opportunities for catch-up in low-income countries* (Policy Research Working Paper 6000). Washington, D.C.: World Bank.

Cheng, T. J., Haggard, S., & Kang, D. (1998). Institutions and growth in Korea and Taiwan: The bureaucracy. *The Journal of Development Studies*, *34*(6), 87-111.

Echevarria, C. (1997). Changes in sectoral composition associated with economic growth. *International Economic Review*, *38*(2), 431-452.

Fallon, P., Hon, V., Qureshi, Z., & Ratha, D. (2001). *Middle-income countries: Development challenges and growing global role*. World Bank, Washington D.C.

Farole, T., Cho, Y., Bossavie, L., & Aterido, R. (2017). Bangladesh jobs diagnostic. *Jobs Series No. 9*. Washington, D.C.: World Bank.

Felipe, J., Abdon, A., & Kumar, U. (2012). *Tracking the middle-income trap: What is it, who is in it, and why?* (Working Paper No. 715). Levy Economics Institute.

Foxley, A. (2009). *Recovery: The global financial crisis and middle-income countries*. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace.

Gill, I. S., Kharas, H. J., & Bhattasali, D. (2007). *An East Asian renaissance: Ideas for economic growth*. World Bank Publications.

Glennie, J. (2013). *Recipients and contributors: Middle income countries and the future of development cooperation.* United Nations Development Programme, New York.

Hak, K. P. (2005). *Productivity performance in developing countries: Country case studies-Republic of Korea*. Vienna: United Nations Industrial Development Organisation.

Islam, N. (1978). *Development strategy of Bangladesh*. New York: Pergamon Press.

Jomo, K. S. (2001). Rethinking the role of government policy in Southeast Asia. In J. Stiglitz and S. Yusuf (Eds.), *Rethinking the East Asian miracle*. New York: Oxford University Press.

KDI. (2011). *Modularization of Korea's development experience: Productivity improvement*. Seoul: Korea Development Institute.

Kimura, F., & Obashi, A. (2011). *Production Networks in East Asia: What we know so far* (ADBI Working Paper 320). Tokyo: Asian Development Bank Institute.

Kingstone, P. (2013). *Poverty, the 'new middle classes' and sustainable development.* Paper presented during the Experts Meeting on the Common Challenges of Middle-Income Countries in Seoul, 13-15 May.

Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *American Economic Review, 45*(1–28).

Mahmud, W. (2008). Social development in Bangladesh: Pathways, surprises and challenges. *Indian Journal of Human Development, 2*(1), 79-92.

Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics, 107*(2), 407-437.

Mujeri, M. K. (2002). Globalization–poverty links in Bangladesh. Some broad observations. In: *Bangladesh facing the challenge of globalization: A review of Bangladesh's Development 2001*. Dhaka: Centre for Policy Dialogue and University Press Limited.

Mujeri, M. K. (2004). Changes in policy framework and total factor productivity growth in Bangladesh. *The Bangladesh Development Studies, 30*(3&4), 1-29.

Mujeri, M. K., & Islam, M. E. (2008). *Rationalizing interest rate spread in the banking sector: Some policy suggestions* (Policy Paper No.0804). Dhaka: Policy Analysis Unit, Bangladesh Bank.

Mujeri, M. K., & Mujeri, N. (2020). *Bangladesh at fifty: Moving beyond development traps*. London: Palgrave Macmillan.

Mujeri, M. K., & Mujeri, N. (2021). *Structural transformation of Bangladesh Economy*: A South Asian perspective. South Asia Economic and Policy Studies, Springer Singapore.

Mujeri, M. K., & Sen, B. (2006). Economic growth in Bangladesh, 1970–2000. In: *Explaining growth in South Asia*. New Delhi: Oxford University Press.

Mujeri, M. K., Shahabuddin, Q., & Ahmed, S. (1993). A framework for analysis of macro-micro transmission mechanisms in Bangladesh: Some preliminary considerations. *Asia-Pacific Journal of Rural Development*, *3*(1), 20-43.

Ohno, K. (2009). Avoiding the middle-income trap: renovating industrial policy formulation in Vietnam. *ASEAN Economic Bulletin*, *26*(1), 25-43.

Ohno, K. (2011). What is the middle-income trap? Asian Development Bank, Seminar. http://www.grips.ac.jp/forum-e/pdf_e11/ADB/middleincome_adb3.pdf.

Organisation for Economic Cooperation and Development. (2011). *Smallholder adjustment in middle-income countries, OECD Food* (Agriculture and Fisheries Working Papers No. 12). Paris: Cervantes-Godoy, D., & Brooks, J.

Paus, E. (2013). Globalization and middle-income trap: A capabilities based ppproach with focus on Latin America. *Challenges of the Middle-Income Countries. Seoul Debates*, 59-63.

PC. (2020). *Making vision 2041 a reality: Perspective plan of Bangladesh 2021–2041*. General Economics Division (GED), Bangladesh Planning Commission, Ministry of Planning, Government of People's Republic of Bangladesh.

Rahman, S. H. (1991). Macro-economic stabilisation and adjustment: The experience of Bangladesh in the 1980s. The Bangladesh Institute of Development Studies, Dhaka.

Rodríguez-Clare, A.. (2005). *Microeconomic interventions after the Washington Consensus* (Working Paper No. 524). Washington DC: Inter-American Development Bank.

Rodrik, D. (1995). Getting interventions right: How South Korea and Taiwan grew rich. *Economic Policy*, *10*(20), 53-107.

Rodrik, D. (2008). One economics, many recipes: Globalization, institutions, and economic growth. In: *One economics, many recipes*. Princeton University Press.

Samuelson, P. A. (1994). Facets of Balassa-Samuelson thirty years later. *Review of International Economics*, *2*(3), 201-226.

Satoru, O. (1997). Industrialization policies of Korea and Taiwan and their effects on manufacturing. *The Developing Economies, 35*, 358-81.

Sen, A., & Dreze, J. (1995). India: Economic development and social opportunity. Oxford: Clarendon Press

Sobhan, R. (1982). *The crisis of external dependence: The political economy of foreign aid to Bangladesh.* London: Zed Press.

Sobhan, R. (1991). *Debt default to the development finance institutions: The crisis of state sponsored entrepreneurship in Bangladesh*. Dhaka: University Press Limited.

Sobhan, R. (1992). *Problems of governance in Bangladesh*. Dhaka: University Press Limited.

Sobhan, R. (1993). Structural maladjustment: Bangladesh's experience with market reforms. *Economic and Political Weekly*, 925-931.

Sobhan, R., & Ahmad, M. (1980). *Public enterprise in an intermediate regime: A study in the political economy of Bangladesh*. Dhaka: Bangladesh Institute of Development Studies.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic development*. 11th edition. New York: Addison-Wesley.

U. N. (2011). Development cooperation with middle-income countries. United Nations General Assembly, 66th Session report of the Secretary-General, New York.

UNDP. (2021). *Global multidimensional poverty index (MPI) 2021: Unmasking disparities by ethnicity, caste and gender*. New York: United Nations Development Programme.

Van Doorn, J., Lemon, K. N., Mittal, V., Nass, S., Pick, D., Pirner, P., & Verhoef, P. C. (2010). Customer engagement behavior: Theoretical foundations and research directions. *Journal of Service Research*, *13*(3), 253-266.

Wang, X., & Weaver, N. (2013). Surplus labour and Lewis turning points in China. *Journal of Chinese Economic and Business Studies*, *11*(1), 1-12.

Weil, D. N. (2013). *Economic Growth*, 3rd ed. Boston, MA: Pearson.

World Bank, & DRC. (2013). *China 2030: Building a modern, harmonious, and creative high-income society*. Washington, DC: Development Research Center (DRC) of the State Council, People's Republic of China and World Bank.

World Bank, (2012). *Leading dragon phenomenon: New opportunities for catch-up in low-income countries (*Policy Research Working Paper 6000). Washington, D.C.: Chandra, V., Lin, J. Y., & Wang, Y.

World Bank. (1993). *The East Asian miracle: Economic growth and public policy*. New York: Oxford University Press.

World Bank. (2006). *Korea as a knowledge economy: Evolutionary process and lessons learned*. Washington D.C: World Bank.

World Bank. (2009). *World development report 2009*. Washington D.C: World Bank.

World Bank. (2010). Robust recovery, rising risks. *World Bank East Asia and Pacific Economic Update, Vol. 2*. Washington D.C: World Bank.

World Bank. (2011). *The changing wealth of nations: Measuring sustainable development in the new millennium*. Washington, D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development.

World Bank. (2012). *Bangladesh: Towards accelerated, inclusive and sustainable growth – opportunities and challenges* (Vol. 2: Main Report No. 67991). Washington, D.C: World Bank.

World Bank. (2013). *Consolidating and accelerating exports in Bangladesh*. Bangladesh Development Series No. 29. World Bank, Dhaka.

World Bank. (2017). *The World Bank Annual report 2017: End extreme poverty, boost shared prosperity*. Washington D.C: World Bank.

World Bank. (2018). *World Development Indicators*. DataBank, Washington D.C: World Bank.

World Bank. (2019). *The Bangladesh development update 2019: Towards regulatory predictability*. Washington D.C: World Bank.